পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারি-২০০৯- ডিসেম্বর ২০০৯

ভারতীয় বিজ্ঞানের অতৃপ্ত আত্মা

গণিত ও সঙ্গীত

কিয়োটো থেকে কোপেনহেগেন

বাস্তবতা চক্রান্ত রাজনীতি

বিপন্ন পরিবেশ বিপন্ন মানুষ ঃ পরমানু বিদ্যুৎ খাদ্য সংকট বিটি বেগুন

শিক্ষার অধিকার আইন

বিকল্প নির্মান ঃ স্বাস্থ্য শক্তি বাসস্থান

স্মরণে ঃ অমল সোম, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ

With best compliments from

DOLPHIN FOAM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

Manufacturer of ISI-marked Natural Foam Rubber (Latex), Mattress, Pillow, Cushion and Rubberized Coir-Mattress, Cushion, etc.

Regd. Office

23/P/13 A. K. Mukherjee Road
Kolkata 700 090

Telephone
Office : 2245 6803, 2216 2974, 2358 9839
Residence : 2337 3638, 2592 0872

Fax 033 91 2245 6803

e-mail : dolphinfoam@vsnl.net

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১-৪ ☐ জানুয়ারি- ২০০৯-ডিসেম্বর-২০০৯

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১-৪
জানুয়ারি-২০০৯-ডিসেম্বর ২০০৯
☐
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
পি ২৫২ লেক টাউন, ব্লক এ
কলকাতা ৭০০ ০৮৯
☐
মূল্য তিরিশ টাকা
☐
Vigyan O Vigyankarmi
Rn. No. 34929/79
☐
Vol. XXXI No. 1-4
January 2009-December 2009
☐
Communication :
C/O Avijit Lahiri
P252 Lake Town, Block A
Kolkata 700 089
☐
e-mail : bob_swf@yahoo.co.in
Website : http://www.scienceandsocietyinbob.com/

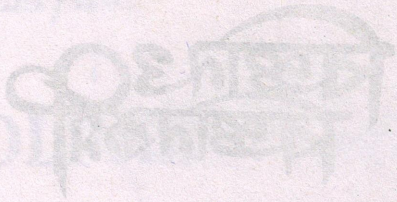

সূচীপত্র

আমাদের কথা		৪
জগদীশচন্দ্র ঃ ভারতীয় বিজ্ঞানের অতৃপ্ত আত্মা	অভিজিৎ লাহিড়ী	৫
অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ 'সুনির্মল' বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সাধক	আশীষ লাহিড়ী	২৩
আন্দামানের 'হিংস্র' জারোয়া - সরকারী ভূমিকা ও সংবাদপত্রের নীরবতা	সুভাষ গাঙ্গুলী	২৭
গণিত ও সঙ্গীতে বারনৌলি ও বাখ্ পরিবার	নিখিলেশ পাল	৩৪
ভারতের জলসংকট	কল্যাণ রুদ্র	৩৭
শিশুর শিক্ষা অধিকার আইন, কি অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূর করবে?	রবীন মজুমদার	৪৩
পারমানবিক শক্তি উৎপাদনের প্রতিটি ফাঁক ও ফোকড় থেকে উঠে আসে মারণ বর্জ্য	পাচু রায়	৪৬
আশংকার রাজনৈতিক অর্থনীতি	দীপঙ্কর দে	৪৯
'অম্বর করিছে অশ্রুবরিষণ'	শঙ্কর রায়	৫৩
প্রকৃতির প্রতিশোধ	সুব্রত সিনহা	৫৮
মোবাইল টাওয়ার কতটা ক্ষতিকর ও পরিবেশ বিনষ্টকারী	অরুণকান্তি বিশ্বাস	৬০
পূর্বকলকাতার জলাভূমি ও আশ্রিত মানুষ — ভবিষ্যৎ কি?	উজ্জয়িনী দাস	৬৩
বাঁকুড়ার গ্রামে ''আমাদের হাসপাতাল'' ও সাম্প্রতিক কিউবার কৃষি ও চিকিৎসাশিক্ষার বৈপ্লবিক সাফল্য	মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	৬৫
ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ বাড়ছে	প্রদীপ দত্ত	৬৯
আয়লা - ও - বাসস্থান	রবীন ব্যানার্জী	৭২
পরিক্রমা		৭৩
দেশজুড়ে খাদ্যের যোগান কমছে - বাড়ছে দাম		৮০
বিষে ভরা বি টি বেগুন থেকে সাবধান		৮২
অমল সোম স্মরণে	কুমারেশ মিত্র	৮৪
ভারতের মৎস্যজীবি ও উপকূল রক্ষা আন্দোলনের পুরোধা হরেকৃষ্ণ দেবনাথ প্রয়াত	প্রদীপ দত্ত	৮৮

আমাদের কথা

সময়ের তাগিদেই বি ও বি আবার বেরোল, একবছর পর। শুভানুধ্যায়ী কেউ কেউ বলছেন, এই ভালো, এমনিতেই নিত্য নতুন পত্রপত্রিকার অভিঘাতে পাঠককুল বেসামাল। পাঠককেও রয়ে সয়ে পড়ার ও ভাবার সময় দিতে হয়। ভালো লেখার জন্যও সময় ও অনুশীলন লাগে।

যুক্তিযুক্ত কথা। তবে বি ও বি'র এই বৎসরান্ত আত্মপ্রকাশ সে জন্য নয়। গত কয়েক বছর ধরেই তখনই বেরোয় বি ও বি যখন প্রকাশের তাগিদ ভেতর থেকেই প্রবল হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আন্দোলনের ঢেউ বা পরিবর্তনের ছোঁয়া বি ও বি-তে উৎসাহী কর্মী সমর্থকের বাড়বৃদ্ধি ঘটায় নি, উল্টে পুরনো সহযোগীরা অনেকে অন্য জরুরী কাজে মন দিয়েছেন। সাপ্তাহিক আড্ডাখানির কথা যাদের মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, তাঁদের অনেকেরই আজ আর জৌলুষের বয়স নেই। তবু যে 'বি ও বি কেন বেরোচ্ছে না' বলে আব্দার অনুযোগ ওঠে, কখনও কোথাও, সেটাই আমাদের প্রেরণা। সেই অস্ফুট সমর্থন, সেই ভালোবাসাই এই সময়ে নতুনভাবে জীবনীশক্তি যোগাচ্ছে — প্রায় স্বতস্ফূর্তভাবেই যথেষ্ট রসদ যোগাড় হয়ে গেল অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই।

পাঠকরা নিশ্চয়ই খেয়াল করতে পারবেন যে এবারেও বি ও বি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে যত্নশীল থেকেছে। প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে যেমন আছে সমসময়ের কাটা-ছেঁড়া, তেমনি আছে সব সময়ের আলোচনাও। ভবিষ্যতের প্রয়োজনেই অতীতকে বার বার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। নিতে হয় আগামীর নির্মাণ প্রয়াসগুলির খোঁজখবরও। ভারতে বিজ্ঞান চর্চার পর্যালোচনা নিরন্তর হওয়া দরকার - জগদীশচন্দ্র বসু ও অক্ষয় কুমার দত্ত কে ধরে প্রকাশিত রচনা দুটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বায়ন এবং উষ্ণায়ন সমগ্র পৃথিবীতেই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। কোপেনহেগেন তাই ছিল অনেকের তীক্ষ্ম নজরে। ভারত কোন দিকে এগোচ্ছে তা বুঝতে এ বিষয়ের উপর আলোচনা বিশ্লেষণ খুবই জরুরী। একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান হতেই পারে আলোচকদের। রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যে 'উন্নয়নের' পথ ধরেছে তা যে ভারতের দরিদ্রদের বিচ্ছিন্ন করে তুলছে, চতুর্দিক থেকে তার প্রমাণ ভেসে উঠছে – পরমাণু বিদ্যুৎ, জিন-প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রকৃতি কিংবা বুনিয়াদি শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন - সেরকমই কয়েকটি সাম্প্রতিক নজির। এবার বিচার পাঠকদের। তাঁদের সব রকমের মতামত জানতে আমরা সর্বদা আগ্রহী।

এভাবে বি ও বি খুব বেশীদিন হয়তো চলতে পারবে না, চুপিসারে হারিয়ে যাবে কালের ভ্রুকুটিতে। কিন্তু বি ও বি যে কাজটা হাতে নিয়েছিল - সমাজ ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন, সার্বিক সামাজিক অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক মনন ও মেজাজের ক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা করে যাওয়া - সেই প্রয়োজনটা কিন্তু এখন আরও তীব্রই হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়ন হচ্ছে বাজার বাণিজ্যের, মানুষের অগ্রগতির বিশ্বায়ন হয় নি। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ কোন কল্যাণী বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে আসেনি। ভোগে-দুর্ভোগে তারা পৃথক রাষ্ট্রের অধীন। উত্তর গোলার্ধের ধনীদের ভোগের জোগানদার হয়ে যাবতীয় দুর্ভোগের শিকার কেন হবে দক্ষিণ গোলার্ধের দরিদ্র মানুষরা? কেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এই অন্যায় অমানবিক পরিবেশ-শত্রু 'উন্নতির' প্রধান মদতদাতা হবে? সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষরা পৃথিবী জুড়ে আওয়াজ তুলছেন, আর্তনাদ করছেন। চট্-জলদি মিডিয়ায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বুদবুদের মত উঠেই মিলিয়ে যায়। স্থিতিশীল মানব-পরিবেশের লক্ষ্যে স্পষ্ট তথ্য, শাণিত যুক্তি, গভীর-বিশ্লেষণ সহযোগে আলোচনা-পর্যালোচনার কোন বিকল্প তো চোখে পড়ে না। আর এতে সাধারণভাবে সব মানুষদের এবং বিশেষভাবে, শিক্ষিত মানুষদের, বিজ্ঞানকর্মীদের আছে এক বিশাল দায়িত্ব। নিজের প্রতি, সমসময়ের প্রতি এবং সর্বোপরি উত্তরপ্রজন্মের প্রতি। এ কাজ চলবে। চলতে থাকবে, বাংলায়, ভারতের সব ভাষায়, পৃথিবীর সব ভাষায়। ইংরেজীতে আবদ্ধ থাকলে তো চলবে না।

বি ও বি'র আরব্ধ কাজ তাই শুধু বি ও বি'র হতে পারে না। আজ যদি সেই প্রয়োজন গভীর হয়ে থাকে, যুগোপযোগী হয়ে উঠে সেই কাজ চলবে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে, নবরূপে, নব নব রূপে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারত এক দিগদর্শী ভূমিকা পালনের দোরগোড়ায় উপস্থিত।

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও লড়াই-আন্দোলন-নবনির্মানের দিশা যাঁরা দেখাতে পারেন এমনই দুজনকে আমরা অকালে হারালাম গত বছরে। একজন - আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী সহমর্মী সহযোদ্ধা - অমল সোম। অপরজন - হরেকৃষ্ণ দেবনাথ - যদিও আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু সময় আমাদের অনেককে তাঁর কাছে এনেছিল। লক্ষ্যে স্থির, সংকল্পে অবিচল, অক্লান্তকর্মী - এমন দুজনকে বড়ো প্রয়োজন ছিল এই সময়ে। ভরসার কথা, তাঁরা রেখে গেছেন কিছু প্রাণিত মানুষকে।

জগদীশচন্দ্র ঃ ভারতীয় বিজ্ঞানের অতৃপ্ত আত্মা

অভিজিৎ লাহিড়ী

[জগদীশচন্দ্রের জীবন কাজ ও মানসিকতার অনুসন্ধানে রত এক নিরলস গবেষক অসুস্থতা সত্বেও এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি বি ও বি'র জন্যই লিখেছেন - সঃ মঃ]

এক।

এই নিবন্ধ পাঠের গোড়াতে শিরোনাম থেকেই প্রশ্ন উঠবে, বিজ্ঞান আবার 'ভারতীয়', অ-ভারতীয় কী? এ প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ, এসে পড়ে অনেক বিতর্ক। আপাতত আমি 'ভারতীয়' কথাটা ব্যবহার করছি জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা ও তাঁর মানসিকতার একটা অভিমুখ বোঝাতে। প্রশ্নটা অবশ্য রয়েই গেল। থাকবেও, কারণ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনা অবধারিত ভাবেই আবর্তিত হবে এই প্রশ্নকে ঘিরে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে জগদীশচন্দ্রের প্রবেশ ঘটেছিল বিজ্ঞানের *ভারতীয় প্রতিনিধি* রূপে, না কি *ভারতীয় বিজ্ঞানের* প্রতিনিধি রূপে, এ প্রশ্নটাই তুলেছেন অনেকে। জগদীশচন্দ্রের জীবন ও বিজ্ঞানচর্চার পর্যালোচক প্যাট্রিক গেডেস-এর মতে, 'দুইই'[1]। তবে এখানে প্রশ্ন হল, এই দুইয়ের সংশ্লেষ ঘটার প্রক্রিয়াটি কি খুব মসৃণ, না কি নানান অভ্যন্তরীণ অভিঘাতে জর্জরিত হতে হতে ক্ষণে ক্ষণে বাঁক নিতে থাকে তার গতিপথ, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত বা পথভ্রষ্টই হয়ে পড়ে তা। এ প্রশ্নের দিকে মুখ করেই আমার এ নিবন্ধ।

দুই।

বসু স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে তাঁর গবেষণা জীবনের গোড়ায় যে সব কাজ করেছিলেন তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তবে একটি ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে তুলনায় কিছুটা কম। আর, এই বিষয়টির সূত্র পৌঁছন যায় বসুর বিজ্ঞান-মানসিকতার প্রায় মর্মস্থলে। আবার এ থেকেই কিছুটা পাওয়া যেতে পারে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে বসুর গবেষণার স্বীকৃতির প্রশ্নে প্রবল বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা।

বসু যে সময়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ করেছেন সেই একই সময় ধরে, দুই-এক দশক আগে থেকেই, ম্যাক্সওয়েল, হার্জ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের হাতে দ্রুত এগিয়েছে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গ-তত্ত্ব। জানা গেছে, আলো এক ধরনের অতি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে আলোর প্রবাহ সম্পর্কে বহু-পরিচিত রশ্মি-তত্ত্বের সঙ্গে তরঙ্গ-তত্ত্বের যোগাযোগ ঠিক কোথায়, সে বিষয়ে গাণিতিক ধারণা যথেষ্ট স্বচ্ছ হয় নি। বস্তুত, এটি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই কালক্রমে স্পষ্ট হয়েছে সনাতনী পদার্থবিদ্যায় কণার গতিপথের সঙ্গে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে তরঙ্গ-ফলন বা ওয়েভ-ফাঙ্কশনের বিবর্তনের সম্পর্ক।

জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজের সূত্রে প্রশমক বা এটেনুয়েটার নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন যার কাজ ছিল তড়িৎ-তরঙ্গের হ্রাস করা। এতে ছিল, দুটি প্রিজ্‌মের মাঝে বায়ুর একটি পাতলা স্তর। দুটির বদলে একটিমাত্র প্রিজ্‌ম ব্যবহার করলে তড়িৎ-তরঙ্গ সেটি থেকে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়, প্রিজ্‌মের ওপারে কোন তড়িৎ-আলোড়ন পৌঁছয় না। এই প্রতিফলন রশ্মি-তত্ত্বের সূত্র মেনে সংঘটিত হয়। এবারে দ্বিতীয় প্রিজ্‌মটি বসালে রশ্মি-তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ণ প্রতিফলন ছাড়া আর নতুন কিছু হওয়ার কথা নয়। পাতলা বায়ু-স্তরের ও পারে ঐ দ্বিতীয় প্রিজ্‌মটি আছে কি নেই, রশ্মি সে কথা 'জানবে' কি করে? আসলে ঘটনা হল, প্রথম প্রিজ্‌মটিকে পেরিয়ে পাতলা বায়ু-স্তরে কিছু আলোড়ন কিন্তু পৌঁছয়[2] - একেবলা হয় বিলীয়মান তরঙ্গ বা ইভানেসেন্ট ওয়েভ।

এই বিলীয়মান তরঙ্গের একটা অংশ আবার দ্বিতীয় প্রিজ্‌মে ঢুকে প'ড়ে চল-তরঙ্গ রূপে বেরিয়ে আসে, এবং এটিই ছিল বসুর উদ্ভাবিত গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া প্রশমিত তরঙ্গ। তরঙ্গ-তত্ব ছাড়া রশ্মি-তত্বের সাহায্যে এই প্রশমনের ব্যাখ্যা কোনমতেই সম্ভব নয়।

তা হলে কি বসু তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের রশ্মি-তরঙ্গ দ্বৈত-সত্তার কথা জানতেন? আপাতদৃষ্টিতে বসু ঐ প্রশমক যন্ত্রটি তৈরী করেছিলেন একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর সব ছেড়ে ঐ বিলীয়মান তরঙ্গের সাহায্য কেন নিলেন তিনি? বিশেষত যখন এই তরঙ্গের তাত্বিক পরিচিতি জানা ছিল না তেমন। আলোক- তরঙ্গের বেলায় এ ভাবে প্রশমিত তরঙ্গ সনাক্ত করায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বহু বার। সম্ভবত সে ধরনের পরীক্ষার কথা জেনেছিলেন বসু, আর তা জেনেই তাঁর প্রবাদ-প্রতীম উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে এক ঢিলে দু পাখী মারলেন তিনি- তড়িৎ-তরঙ্গের প্রাবল্য হ্রাসও করা হল আবার বিলীয়মান তরঙ্গেরও প্রমাণ পাওয়া গেল হাতে-নাতে। বসুই প্রথম বুঝেছিলেন, অতি-স্বল্প দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গের বদলে সেন্টিমিটার পর্যায়ের তড়িৎ-তরঙ্গের বেলায় খুব সহজেই সম্ভব হবে প্রশমিত তরঙ্গ সনাক্ত করা। বিলীয়মান তরঙ্গ থেকে প্রশমিত তরঙ্গ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম তত্ত্বে সুড়ঙ্গ-ক্রিয়া বা টানেলিং নামে পরিচিত।

অথচ বসু কিন্তু বিলীয়মান তরঙ্গের গাণিতিক চর্চায় প্রবেশ করলেন না। অনেক সময় বলা হয়, বসু ছিলেন নিছক এক প্রতিভাবান যন্ত্রবিদ, গাণিতিক প্রতিভা তেমন কিছু ছিল না তাঁর। আসলে বসুর প্রতিভা ও তাঁর বিজ্ঞান-মানসের স্বরূপ ছিল আরো জটিল প্রকৃতির, এবং-কিছুটা পরিমাণে-অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত। একে ঠিকমত না বুঝলে, পড়তে হবে বিরাট ভুলের গহ্বরে (আমার আগের এক নিবন্ধ এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়েছিল কিছুটা[3])।

তিন।

একটা অকথিত অথচ বহুল-প্রচলিত ধারণা হল, গাণিতিক বা তাত্ত্বিক প্রতিভা, আর যন্ত্রবিদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা, এ দুটি দুই ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান-প্রতিভা - এ দুই এর নানান অনুপাতে মিশ্রণেই মূর্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন গবেষকের ভিন্ন চেহারার বিজ্ঞান-প্রতিভা। এখানে অবশ্য মানব-প্রতিভার স্বরূপ বা তার প্রকৃতি বোঝা বা বোঝানোর কোন ইচ্ছাই আমার নেই, সাধ্য ত দূরের কথা। তবে একটা কথা শুধু আমার মনে হয় - প্রতিভার মূল মানব-মননের যে গভীরতার জায়গায় নিহিত সেখানে এ ভাবে স্বাতন্ত্র চিহ্নিত করা খুব বিপজ্জনক।

প্রতিভা বলতে যদি সৃষ্টিশীল চিন্তার ক্ষমতা বুঝি, তবে প্রথমেই তার পার্থক্য করতে হবে, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতার সঙ্গে। এই দ্বিতীয় ধরনের ক্ষমতাকেই বিজ্ঞান-চিন্তার মূল অভিজ্ঞান বলে ধরা হয়। তবে এটা কিন্তু মুদ্রার একটা পিঠ মাত্র।

বস্তুত, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রক্রিয়াটিকে যদি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করতে হয়, তবে তিনটি পর্যায়ের ক্রমিক পুনরাবর্তনের কথা এসে পড়ে - প্রকল্প বা তত্ত্বগঠন, অবরোহী বা ডিডাকটিভ যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় তা থেকে নানান সিদ্ধান্ত গঠন, আর পরীক্ষণ। এবং তার পর প্রয়োজন হলে পুরান তত্ত্ব খারিজ করে (কার্ল পপার আলোচিত খণ্ডন বা রেফুটেশন[4]) আবার নতুন প্রকল্প গঠন। এদের ভিতর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে টমাস কুন *নর্মাল সায়েন্স* বা স্বীকৃত বিজ্ঞান নাম দিয়েছেন। কুনের মতে, স্বীকৃত বিজ্ঞানের চর্চায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে এক ধরনের স্থিতাবস্থার ভিতর দিয়ে। আর, সেই স্থিতাবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়ে যখন সম্পূর্ণ নতুন কোন প্রকল্প (হাইপথেসিস) বা তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা ঘটে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায়।

এরই অন্যতম উপাদান হল, এক ধরনের যৌক্তিক উল্লম্ফন। অবশ্য, স্বীকৃত বিজ্ঞানের চর্চায়ও যৌক্তিক উল্লম্ফনের ভূমিকা অগ্রাহ্য করার মত নয়। আর, এরই সূত্র ধরে এসে পড়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মতাদর্শের ভূমিকার কথাও। অবশ্য, কুন বা পপার[5] একটু ভিন্ন প্রসঙ্গেও মতাদর্শের কথা বলে থাকেন - তা হল নতুন তত্ত্ব বা অনুমানের বিপরীতে পুরান তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবণতা।

কুন অবশ্য যৌক্তিক উল্লম্ফনের বিশ্লেষণে বড় একটা যান নি, তিনি বেশী করে আলোচনা করেছেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে মতাদর্শের দিকটি নিয়ে। পপার মতাদর্শ বা ইডিওলজিকে স্পষ্ট করেই বিজ্ঞানের বিরোধী উপাদান বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের ভিতর মতাদর্শ আমাদের অগোচরে মিশে রয়েছে, একথা খুব স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তিবাদী মনের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। অবশ্য পপার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হাইপথেসিস বা কনজেকচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করেন নি। তবে তাঁর মতে, কনজেকচারের ভিতরই নিহিত থাকে বিপদের বীজ। যার জোরে এমন কি মার্কসবাদ বা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আসলে মতাদর্শ হয়েও অনেকের কাছে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পায়। তাই বিজ্ঞানের নিয়ামক উপাদান হল খণ্ডন বা রেফুটেশন।

প্রকল্প বা তত্ত্ব গঠনের প্রক্রিয়াটি যে কোন এক নিশ্ছিদ্র যৌক্তিক প্রক্রিয়া নয়, সে কথা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হয়ে আসছে। পপার ত এই অ-যৌক্তিকতার কারণেই বিরূপ ছিলেন প্রকল্প গঠনের প্রক্রিয়ার ওপর। বিজ্ঞানের দর্শন ও ইতিহাস প্রসঙ্গে মাইকেল পোলানী[6] এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন, এবং বিশেষ করে কারিগরী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। কারিগরী উদ্ভাবনে যে প্রতিভা বা মনন-ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তার আলোচনায় পোলানী কার্যকারিতার নীতি বা অপারেশনাল প্রিনসিপ্‌ল সম্বন্ধে ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-চিন্তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে সুব্রত দাসগুপ্ত এই প্রসঙ্গটি এনেছেন [7], পোলানীর বক্তব্য অনুসরণ করে।

কোন কারিগর যখন কোন অত্যাশ্চর্য নির্মানকার্য করেন বা কোন এক চমকপ্রদ যন্ত্র তৈরী করেন তখন তিনি কিন্তু জানেন না ওই যন্ত্রের বিশদ গাণিতিক বা তাত্ত্বিক নীতি। বস্তুত, অনেক সময়ই সে নীতি বুঝতে তাত্ত্বিকেরাই হিমসিম খেয়ে যান। আসলে কারিগর যা জানে তা হল যন্ত্র নির্মানের *কার্যকারিতার নীতিটি*। আর, পোলানীর মতে, দক্ষ কারিগর এই কার্যকারিতার নীতি আয়ত্ব করেন আনুষঙ্গিক নানান বিষয়ে এক ধরণের *অন্তর্লীন ধারণা* বা ট্যাসিট নলেজ থেকে। এই অন্তর্লীন ধারণা অর্জন করা বা তা কাজে লাগানো, কোনটাই কিন্তু অবরোহী বা ডিডাকটিভ যৌক্তিক প্রক্রিয়া নয়। এর ভিতর মিশে থাকে ব্যক্তি-মানসের নানান উপাদান, এবং এই ব্যক্তি-মানসেরই সূত্র ধরে নানান স্থানিক, সাময়িক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক উপাদান। আর, ঠিক এই কারণেই এর অবস্থান মতাদর্শের খুব কাছাকাছি।

সুব্রত দাসগুপ্ত যখন পোলানীর বক্তব্য অনুসরণ করে জগদীশ-পর্যালোচনায় এই কার্যকারিতার নীতির প্রসঙ্গ তোলেন,

তখন বুঝতে হয়, তিনি জোর দিচ্ছেন জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র-উদ্ভাবন দক্ষতার দিকটির ওপর। বস্তুত, তড়িৎ-তরঙ্গের সংগ্রাহক যন্ত্রে গ্যালেনা নামক খনিজ-পদার্থের ব্যবহার ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় ছাড়া বসুর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তেমন কোন মৌলিকত্বের সন্ধান পান নি দাসগুপ্ত। অর্থাৎ, তাঁর মতে, বসুর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা এক অর্থে নরমাল সায়েন্স - আশিস নন্দী বর্ণিত বিকল্প বিজ্ঞান বা অল্টারনেটিভ সায়েন্স নয়[৪]। দাসগুপ্তের এই মতের সরাসরি বিরোধিতা না করেও কিছু বলার থেকেই যায় এ প্রসঙ্গে - সে কথায় পরে আসছি।

আসলে কার্যকারিতার নীতির ভিত্তি হল অন্তর্লীন ধারণা। মানব-মননের অভ্যন্তরে প্রদেশে এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে থাকে অন্তর্লীন ধারণা, অর্থাৎ যে সব ধারণা সচেতন মনে সে ভাবে দানা বাঁধে নি সেগুলি। এখানে আমি ট্যাসিট নলেজ বোঝাতে অন্তর্লীন 'জ্ঞান' না বলে 'ধারণা' শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ আমার মনে হয়, সচেতন মনে যা একাট মোটামুটি স্পষ্ট বা বর্ণনা-যোগ্য অবয়ব লাভ করেছে তাকেই 'জ্ঞান' বলা সঙ্গত। আর, 'ধারণা' অত নির্দিষ্ট কোন ব্যাপার নয়। পোলানীর কথায়, 'আমরা যা প্রকাশ করতে পারি তার চাইতে বেশী জানা সম্ভব'। অর্থাৎ, জানি অথচ প্রকাশ করতে পারছি না, এটাই হল ট্যাসিট নলেজ। যা জানি আর প্রকাশও করতে পারি, তাকেই আমি 'জ্ঞান' বলতে চাইছি। আর মনের অধঃ-স্তরে ছড়িয়ে থাকা অবয়বহীন নানান উপাদানকে একযোগে নাম দিচ্ছি অন্তর্লীন ধারণা।

পোলানী সৃজনশীল চিন্তার উৎস সন্ধান করেছেন এই অন্তর্লীন ধারণার অচেনা অথচ উর্বর ভূমিতে। আর, আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি, তবে কারিগরী উদ্ভাবনের বিশেষ ক্ষেত্রটিতে অন্তর্লীন ধারণার ভূমিকা বোঝাতে কার্যকারিতার নীতির কথা বলেছেন তিনি। তাই, বসুর গবেষণা ও চিন্তার প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে দাসগুপ্ত যখন অন্তর্লীন ধারণার প্রসঙ্গে না গিয়ে কার্যকারিতার নীতির ওপর জোর দেন, তখন মনে হয় নিজের অজান্তেই হয় তা পর্যালোচনার ক্ষেত্রটিকে একটু বেশী সংকীর্ণ করে ফেলেছেন তিনি।

কারণ অসাধারণ কিছু পরিমাপ-যন্ত্র উদ্ভাবন কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল না কোনদিনই। তিনি প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিলেন মৌল বিজ্ঞানের গবেষক। যন্ত্র ত তিনি তৈরী করেছেন বহু, গবেষণার কাজে যখন যেমন দরকার হয়েছে তেমন। যন্ত্র উদ্ভাবন ছিল তাঁর বিনোদন। নিজের মত করে যন্ত্র তৈরী করে নিতে না পারলে তাঁর মন ভরত না (অবশ্য এর একটা প্রয়োজনের দিকও ছিল - যন্ত্র কিনে কাজ করার মত অর্থের অনুদান সব সময় না পাওয়া)। এটাও হয়ত অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে, এই যন্ত্র তৈরীর নেশা তাঁর মৌল গবেষণার কাজকে কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল কি না।

কিন্তু যে কথাটা থেকেই যায় তা হল, বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের আগ্রহ — বস্তুত এটাই ছিল তাঁর সমস্ত কাজের চালিকা শক্তি। আর, এখানেই এসে পড়ে তাঁর মনোজগতে অন্তর্লীন ধারণার প্রশ্ন, কিছুটা পরিমাণে তাঁর মতাদর্শের প্রশ্ন, তাঁর 'ভারতীয়তত্বের' প্রশ্ন। সর্বোপরি, এই সূত্র ধরেই আমি বুঝতে চাই জগদীশচন্দ্র নামক বিশাল প্রতিভার ব্যর্থতা-সাফল্যের বিষয়টিকে।

চার।

সৃজনশীল চিন্তার বিষয়টি আসলে মনোবিজ্ঞানীদের এবং যন্ত্রগণক-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকদের এক্তিয়ার-যদিও অবশ্য 'এক্তিয়ার' বিচার করাটা সবসময় খুব স্বাস্থ্যকর নয়। পোলানীকে বা কুনকে তাই এ বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ' বলা চলে না। এক্তিয়ার-বহির্ভূত আলোচনার একটু ঝুঁকি মেনে নিয়েই বলছি, 'বিশেষজ্ঞ'রা সৃজনশীল চিন্তা প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করেছেন ও আরো করছেন[৩]। এটি অধুনা-উদ্ভূত বোধ-বিজ্ঞান বা কগনিটিভ সায়েন্সের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

সৃজনশীল চিন্তা করছেন যে গবেষক, প্রচলিত কোন তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব পর্যবেক্ষণের সংঘাত নিরসন করতে নতুন পথের সন্ধান করেছেন যিনি, তাঁকে ডুব দিতে হয় নিজের মনের গভীরে, সকলের অগোচরে একা একা প্রবেশ করতে হয় অন্তর্লীন ধারণার নেপথ্য জগৎটিতে। তবে একটা জিনিস কিন্তু আগে থাকতেই ঠিক হয়ে থাকে - তা হল ঐ নিঃসঙ্গ মানুষটিরে উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তত আবছা একটা রূপরেখা। কি চাইছেন তিনি বিলীয়মান তরঙ্গের গাণিতিক তত্ব, না কি একটা যুতসই প্রশমক যন্ত্র উদ্ভাবন? প্রশমক উদ্ভাবনই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তা কোন পথে? তরঙ্গ প্রশমিত করার ত কতই উপায় আছে - সেই সব চেনা উপায়ের কোন একটি ধরে বেশী ঝামেলায় না গিয়ে, নাকি সমসাময়িক অন্য একটি অপেক্ষাকৃত অচেনা অথচ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি ধারণার পরীক্ষাগত প্রমাণও এই একই সঙ্গে পাওয়া যায় কি না সেই সৃষ্টিছাড়া খামখেয়ালের পথ ধরে? এই উদ্দেশ্য বা পথ-নিরূপণও অবশ্য স্থির হয় গবেষকের ব্যক্তিমানসের নানান উপাদান দিয়ে, যার হদিশ হয় ত সবটা জানেন না গবেষক নিজেই। অবশ্য এমনও হতে পারে, বিলীয়মান তরঙ্গের কথাটা প্রথমেই মাথায় আসে নি জগদীশচন্দ্রের - হতে পারে, কোন এক বড় আকারের সন্ধান-মণ্ডল ধরে সন্ধান করতে গিয়ে মাথায় এসেছিল সে কথা। সন্ধান বা সন্ধান-মণ্ডল বলতে কি বোঝাচ্ছি, সে কথায় আসছি। সে যাই হোক, কোন এক উদ্দেশ্য বা অভিমুখ নিয়েই শুরু করেন গবেষক। তবে সেটা হয়ত মনস্তত্বের ভিন্ন প্রশ্ন।

এবারে কথা হল, মনোজগতের সেই গুপ্ত কুঠুরিটিতে ঢুকে কোন নিয়মতন্ত্র অনুসরণ করে খামখেয়ালের খেলা শুরু করেন ঐ আমাদের প্রফেসর শঙ্কু? সেই ধোঁয়াশার জগতের কোন 'নিয়মতন্ত্র' আদৌ কি নিরূপণ করা সম্ভব 'বাইরে' থেকে? কারণ নিয়মতন্ত্র বলতে যা বুঝতে চাইছি তাও ত ঐ 'বাইরের' জগতের ব্যাপার, যৌক্তিক মননের ব্যাপার। তবু, যৌক্তিক মননের পথ অনুসরণ করে কোন একটা 'মডেল' বা প্রতিরূপ খাড়া করার চেষ্টা করা যেতেই পারে।

আমি যতটুকু বুঝেছি, বিশেষজ্ঞদের মত এখন পর্যন্ত অনেকটা এরকম: নানা ধরনের ধারণার উপাদান সম্বলিত কোন এক সন্ধান-মণ্ডল বা 'সার্চস্পেস' ধরে সন্ধান করতে থাকেন সেই গবেষক। এই সব ধারণাকে নানা ভাবে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ ঘটিয়ে দেখতে থাকেন তিনি, যতক্ষণ না তাঁর মনে হয়, ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তাঁর। তবে, সম্ভবত, ঘাড় গোঁজ করে রোবটের মত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ কাজে নামেন না তিনি। আপন অভিরুচি অনুযায়ী, কিছু 'নীতি' অনুসরণ করেন গবেষকটি। যেমন, সদৃশতার নীতি। তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু হয় ত ভিন্ন কোন প্রকৃতির, ধারণা বা ধারণাবলীর কোন সংশ্লেষের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে বেছে বেছে নির্দিষ্ট কিছু সম্ভাবনা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকেন তিনি, চালাতে থাকেন তাঁর সন্ধান-ক্রিয়া। অথবা হয় ত আইনষ্টাইনের মত 'সরল সমাধানের নীতি' বা 'প্রিন্সিপ্‌ল অভ সিমপ্লিসিটি'র[10] সাহায্য নিতে দেখা যায় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত 'ভাগ্য' সহায় হলে নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে চরিতার্থতা লাভ করেন 'পাগল' সেই মানুষটি।

নতুন প্রকল্প গঠনের প্রক্রিয়াটিকে আইনষ্টাইন অবশ্য 'মনের অবাধ সৃষ্টি' বলে অভিহিত করেছেন [11], কিন্তু তিনি 'অবাধ' কথাটি ব্যবহার করেছেন সম্ভবত এটাই বোঝাতে যে, আঁটোসাটো যুক্তির নিয়মতন্ত্র মেনে চালিত হয় না এই প্রক্রিয়া। বস্তুত নানান বিকল্প সম্ভাবনার ভিতর থেকে একটিকে বেছে নেওয়া হয এখানে, আর এই বেছে নেওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। তবে, ওই যা বললাম, সুনির্দিষ্ট কোন এক যুক্তিপ্রকরণ না থাকলেও অন্তর্লীন ধারণার জগতে কোন একটা প্রক্রিয়া ত চলেই। সেটা আর যাই হোক, কোন ডিডাক্টিভ রেখা বেয়ে যুক্তিশৃঙ্খল গঠন নয়। আর, এখানেই এসে পড়ে মতাদর্শ, এখানেই এসে পড়ে ভারতীয়ত্ব। এসে যেমন অসাধারণ বিশেষত্বে মণ্ডিত করে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চাকে, তেমনই আবার প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণও করে তাকে।

আমার অভ্যন্তরীণ সন্ধান-মণ্ডল কতটা বিস্তৃত হবে, কোন কোন উপাদানে গঠিত হবে তা, মনন -প্রক্রিয়ার কোন অভিজ্ঞানের নিরিখে তার একটি উপাদানের সঙ্গে অপর উপাদানের সংশ্লেষ ঘটাব আমি, আত্ম-বিস্মৃত ভাবের ঘোরে কোনটাকে ফেলব আর কোনটাকেই বা রাখব, তা কিন্তু একান্তভাবেই আমার ভিতরকার রসায়ন। আমরা একদম নিজস্ব ভাললাগা মন্দ-লাগা, নিজস্ব অভিরুচি, নিগূঢ় নানান আকাঙ্খা সে রসায়নের উৎস-ভূমি, যার অনেক কিছু আমার নিজের কাছেই অস্পষ্ট। তবে আমার কাছে অস্পষ্ট হলেও তার একটা ইতিহাস কিন্তু থাকতেই পারে। আর, সে ইতিহাস হল আমার ব্যক্তি-সত্ত্বা গঠনের ইতিহাস, আমার সামাজিক সত্ত্বা গঠনের ইতিহাস, যে সংস্কৃতি কথা বলছে আমার ভিতর দিয়ে, সেই সংস্কৃতির ইতিহাস। এক কথায়, আমার *মতাদর্শের* ইতিহাস।

আর, এই ইতিহাসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সূত্র ধরেই হয়ত পার্থক্য তৈরী হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের সৃজনী-প্রতিভার ভিতর। এমন কি, হয়ত বা কাব্য-প্রতিভা আর গণিত-প্রতিভার ভিতরও। অবশ্য এখানে আমি উদ্যম, ধৈর্য, নিষ্ঠা, এ গুলির কথা ধরছি না। এ গুলির মনস্তত্ব সন্ধান আবার ভিন্ন প্রশ্ন।

পদার্থবিজ্ঞানে মহাবিশৃঙ্খলা বা কেয়স-এর তত্ত্ব আজ অনেকের কাছেই কিছুটা পরিচিত। মহাবিশৃঙ্খলার তত্ব বলে, আপাতদৃষ্টিতে সরল কোন গতীয় তন্ত্রের আচরণবিধি কিন্তু অসম্ভব ধরনের জটিল প্রকৃতির হতে পারে। আর, এর গতীয় দশা তার অতীত ইতিহাসের উপর এত প্রবল ভাবে নির্ভর করে যে সে ইতিহাসের সামান্যতম হের-ফেরেই পরবর্তী গতীয় দশায় এসে পড়ে বিস্তর পার্থক্য[12]। অর্থাৎ, ঐ গতীয় তন্ত্রের আচরণ স্ব-নির্ধারিত বা সেলফ-ডিটারমিন্‌ড হলেও বাইরে থেকে *নির্ধারণযোগ্য* বা ডিটারমিনেব্‌ল নয়।

এটিকেই ব্যক্তি-প্রতিবার বিকাশের ইতিহাসের একটা উপমা বা মেটাফর বলে ধরা যেতে পারে।

এত কথা বললাম এই কারণে যে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা মূলগত ভাবে গণিত-মুখী ছিল, না কি তা তুলনায় অপকৃষ্ট যন্ত্র-উদ্ভাবনী প্রকৃতির, সে আলোচনা বা অনুসন্ধান অনেকটাই নিরর্থক। একই উৎস-ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়ে এরা বিকশিত হয় দুটি ভিন্ন অভিমুখে। মাইকেলসন বা ফ্যারাডের সঙ্গে আইনষ্টাইনের প্রতিভার তুলনা করে উৎকর্ষের বিচার যেমন অর্থবহ নয়। বরং এ ভাবে বলাই ভাল যে জগদীশচন্দ্র তাঁর পুরো গবেষণা-জীবন ধরেই *মৌলিক* অনুসন্ধান এবং মৌলিক উদ্ভাবনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং তাঁর সে কাজ সরাসরি গাণিতিক প্রকৃতির না হলেও, তা ছিল তাত্ত্বিক চেতনা ও বোধ-সম্পৃক্ত। বিলীয়মান তরঙ্গ কাজে লাগিয়ে প্রশমক তৈরীর দৃষ্টান্তটি তারই ইঙ্গিত।

বসুর প্রতিভা ঠিক কতটা *মৌলিক*, বা তাঁর কাজ বিশ্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডারে কতটা উঁচুতে আসন লাভ করার যোগ্য, তা নিয়ে ভাবিত

হয়েছেন অনেকেই। তাঁর ওপর অবিচার হয়েছে কতটা, সে আলোচনাও মনোযোগী দাবী করতে পারে। কিন্তু তার পরও একটা প্রশ্ন থাকে। তা হল, আন্তর্জাতিক মহলে বসুর কাজের স্বীকৃতির ব্যাপারে এত বৈপরীত্য কেন। আর তাঁর সময়কার বিজ্ঞানী-মহলের স্বীকৃতির প্রশ্ন যদি বাদও দেওয়া যায়, তবু তাঁর বিজ্ঞান-চর্চার কাহিনীতে এত নানান বাঁক কেন। বিষয় আর পদ্ধতির বিচারে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, মসৃণতার এত অভাব কেন। আমার ধারণা, এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই কিছু প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছন সম্ভব।

পাঁচ।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চার গোটা অধ্যায়টিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে ভাবা যেতে পারে। প্রথম পর্বে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা, বিশেষত স্বল্প দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-তরঙ্গ সংক্রান্ত বহুবিধ কাজ। তাঁর অন্য সব কাজের কথা বাদ দিয়ে শুধু যদি এই পর্যায়ের কাজের কথাই ধরা যায় তবু তার বিস্তৃতি, মৌলিকত্ব, এবং যে পরিস্থিতির ভিতর তিনি তা করেছিলেন সেই পরিস্থিতির কথা ভাবলে বিহ্বল হতে হয়। অবশ্য তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই। বসুর গবেষণার পরবর্তী পর্যায় হল, বাইরে থেকে আরোপিত উত্তেজনায় প্রাণী আর জড়-পদার্থের যে সাড়া বা রেস্‌পন্স তাদের ভিতরকার সাদৃশ্য বিষয়ে। বসুর এই পর্যায়ের গবেষণাই তাঁকে দিয়েছিল 'খ্যাপাটে' বিজ্ঞানীর (অ-)খ্যাতি। আর, এর পর তিনি আবার বিষয় পরিবর্তন করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণায়। কিন্তু ততদিনে তাঁর ঐ দ্বিতীয় পর্বের গবেষণা তাঁকে সরিয়ে এনেছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-অনুসন্ধানের মূল স্রোত থেকে বেশ কিছুটা দূরে। অথচ আমার মনে হয়, প্রধানত এই পর্যায়ের কাজের নিরিখেই বসুকে হয়ত বলা চলে 'ভারতীয় বিজ্ঞানের আত্মা'।

বসুর গবেষণার এই তিনটি পর্যায় ধরে আলোচনা করেছেন সুব্রত দাসগুপ্ত। তাঁর প্রথম পর্বের কাজের জন্যই বসু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সব চাইতে বেশী[13]। দাসগুপ্তর মতে সেই সময়কার বসুর দুই-একটি কাজ ছিল গুণগত মানের বিচারে মৌলিক, তবে সামগ্রিক বিচারে এই পর্যায়ের প্রায় সব কাজই ছিল তখনকার বিজ্ঞান গবেষণার মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তার খুব কাছাকাছি। এক অর্থে এই কাজগুলিকে বলা যেতে পারে, তখনকার 'স্বীকৃত বিজ্ঞান' বা 'নর্মাল সায়েন্স' - এর অংশ। অবশ্য বলা দরকার, নর্মাল সায়েন্স মানে যে শুধু গতানুগতিক কাজ, তা কিন্তু একেবারেই নয়। কুন বর্ণিত নর্মাল সায়েন্স সম্বন্ধে এ বিভ্রান্তি কিছুটা আছে, যদিও কুন নিজে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টির মত তেমন কিছু বলেন নি। বস্তুত, স্বীকৃত বিজ্ঞান হল বিজ্ঞান-গবেষণার সেই পর্যায় যা সংঘটিত হয় একটা প্যারাডাইম বা বিজ্ঞানের একটা কল্পচিত্র ধরে। সে অর্থে নতুন একটা প্যারাডাইমের আত্মপ্রকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা অপেক্ষাকৃত বিরল ঘটনা। তবে স্বীকৃত বিজ্ঞান বলতে কুন যা বোঝান, সেই পর্যায়েও কিন্তু সৃজনশীল বা মৌলিক কাজ হতেই থাকে। অবশ্য তা হয় ঐ কোন এক নির্দিষ্ট প্যারাডাইম ধরেই।

বসুর প্রথম পর্যায়ের কাজের সময় আলোক-রশ্মি ও তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের আচরণ-বিধি সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলি জানা ছিল। তাই সে অর্থে প্যারাডাইম শিফ্‌ট বা কল্পচিত্র বদলের প্রয়োজন দেখা দেয় নি। বসুর উদ্দেশ্যও তা ছিল না। তবু, সেই প্যারাডাইমের চৌহদ্দির ভিতর থেকেও তাঁর সে সময়কার কাজ ছিল সৃজনশীল ও মৌলিক গবেষণা, এবং আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত মানদণ্ডের নিরিখে, উৎকৃষ্ট।

অবশ্য 'আন্তর্জাতিক মহল' বলতে যে কি বোঝায়, তা নিয়ে তর্ক থাকতেই পারে। কারণ বিজ্ঞান-চর্চা তখনই বা আক্ষরিক অর্থে কতটা আন্তর্জাতিক ছিল আর আজই বা কতটা, তা নিয়ে ত গভীর সন্দেহই রয়েছে। আন্তর্জাতিক না বলে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বললে আর একটু সঠিক হয়। এই বিজ্ঞান পরিণত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে পশ্চিমী জগতে, প্রায় পুঁজিবাদের হাত ধরে। আর পুঁজিবাদী ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে এর যোগসূত্রও স্থাপিত হয়েছে বহুদিন। তাই শুধু ঔপনিবেশিক যুগেই নয়, অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রটিতে 'শহর' আর 'গ্রাম'-এর একটা বিভাজন বেশ স্পষ্টই বলা চলে। জগদীশচন্দ্রই বলা যায় প্রথম বিজ্ঞানী যিনি গ্রাম থেকে উঠে এসে শহরে নজর কাড়লেন।

এই নজর কাড়ার কাজটি খুব যে সহজ বা মসৃণ তা কিন্তু বলা যায় না। শুধু প্রচুর প্রতিভাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, সে প্রতিভার প্রয়োগ-প্রণালীও আয়ত্ত করতে হয়, শহুরে বিজ্ঞানের যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি, তাকে যতটা সম্ভব নিজের করে নিতে হয়। আর, এখানেই সংঘাত বাধে দুই সংস্কৃতির, দুই মতাদর্শের। এটা কিন্তু ঠিক সমানে সমানে সংঘাত নয়, ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত একটা সংস্কৃতি ও মতাদর্শের সঙ্গে সে কাঠামোর বাইরের এক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের সংঘাত। প্রচুর প্রতিভা সম্বল করে এই সংঘাতের আবর্ত পেরিয়ে অনেকটা এগোন যায় ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি এড়ানো যায় না এর প্রবল পিছুটান। আর, গ্রামের সংস্কৃতি বলেও একে ঠিক বোঝান যায় না, কারণ এর ভিতর মিশে রয়েছে ব্যক্তি-মানুষের মতাদর্শ।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ভাবধারা আয়ত্ত করে, তার নিয়মতন্ত্র বুঝে নিয়ে তবেই

করা যাবে বিজ্ঞানের চর্চা। তবে এখানেই কিন্তু শেষ নয়, বাকী রয়ে গেল আসল কথাটাই - অর্থের যোগান। অর্থের যোগান, সম্পদের যোগান, পরিকাঠামোর যোগান, 'গ্রামের' পরিবেশে যার কোন সম্ভাবনাই নেই। এমনকি সেই গ্রামের প্রেসিডেন্সী কলেজ নামক উজ্জ্বল অট্টালিকার ভিতরও। এক হাতে খল-নুড়ি আর এক হাতে খাগের কলম ধরে বেশী দূর বিজ্ঞান করা যায় না, যদিও প্রেসিডেন্সী কলেজের চার দেয়ালের ভিতর প্রায় সেই অসম্ভবই সাধন করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। আসলে, সম্ভব-অসম্ভবের হিসাবটাই তছনছ হয়ে যায় জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, বা মেঘনাদদের বেলায়।

অবশ্য সব হিসাব তছনছ হয়ে যায় যত সহজে বলছি তা কিন্তু নয়। শেষ পর্যন্ত একটা হিসাবের পাওনা কিন্তু মেটাতেই হয়। বিশ্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডারে অবদান রাখতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ক্ষমতার কাঠামোর নিষ্পেষণ এড়ানো যায় না পুরোটা। মর্মান্তিক সংগ্রামের অন্তহীন প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত মনের গহনে জমতে থাকে অবসন্ন শূন্যতা। ছিন্ন হয় বিজ্ঞান-চর্চার মসৃণ গতিপথ।

এর আগে অন্য দুই-একটি নিবন্ধে[14] আমি খুব আলগা ভাবে হলেও দেখানোর চেষ্টা করেছি, ভারতীয় বিজ্ঞানের তখনকার রথী-মহারথীদের বিজ্ঞান-চর্চার কি ভাবে অধরা রয়ে গিয়েছিল চরিতার্থতার তৃপ্তি। সম্ভবত এক গভীর শূন্যতা-বোধ থেকে কি ভাবে বারে বারে বাঁক নিয়েছিল তাঁদের বিজ্ঞান-গবেষণার ধারা। এর ব্যতিক্রম ছিলেন না এমন কি জগদীশচন্দ্রও।

> *এ গুলি সবই, এক অর্থে অনুমান-নির্ভর কথা। তবু এক এক সময় মনে হয়, অনুমান টুকুই যদি উপস্থিত করা যায় পাঁচ জনের সম্মুখে, ক্ষতি কি? এমন কি, একে 'বিজ্ঞান' বলারও যুক্তি আছে কিছু। স্বয়ং পপার বলেছেন, বিজ্ঞানের প্রধান অভিজ্ঞান-চিহ্ন হল, খণ্ডন-যোগ্যতা। আমার অনুমানগুলিও ত খণ্ডন-যোগ্য। তবে আর একে বিজ্ঞান বলতে বাধা কোথায়?*

পশ্চিমী বিজ্ঞানের নিয়মতন্ত্র রপ্ত করতে তেমন অসুবিধা হয় নি জগদীশচন্দ্রের। তবে অর্থের যোগানে অসুবিধা ছিল বৈকি। আর সে বাধা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল তাঁর প্রবাদ-প্রতিম যন্ত্র-উদ্ভাবনী ক্ষমতার সহায়তায়। অত্যন্ত অনাড়ম্বর ঢং-এ, সাধারণ সব প্রায়-ঘরোয়া জিনিসপত্র কাজে লাগিয়ে তিনি বানাতেন আশ্চর্য নানান যন্ত্র। প্রশমক যন্ত্রটি তিনি তৈরী করেছিলেন অত্যন্ত সস্তা উপকরণ - রাস্তা ঢালাইয়ের পীচ আর বালির মিশ্রন (এসফল্‌ট) - দিয়ে। আলোক-তরঙ্গের বেলায় এ রকম মোটা দাগের ব্যবস্থায় কাজ হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু বসু বুঝেছিলেন, তাঁর তড়িৎ-তরঙ্গ মেনে নেবে এই ঘরোয়া ব্যবস্থা, কারণ এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোর তুলনায় বহুগুণ বেশী। এমন কি এ ক্ষেত্রে প্রিজ্‌মের সীমা-তলগুলিকে তত নিখুঁত ভাবে মসৃণ না করলেও ক্ষতি নেই। এ ভাবেই তৈরী হয়েছিল প্রশমক যন্ত্র - পশ্চিমী মানসিকতার সঙ্গে যার কোন মিলই নেই।

পুঁজিবাদের পথ ও পদ্ধতি সাধারণত উপকরণ-নির্ভর। কারণ যে দেখেছে, উপকরণের সহায়তায় মানুষের ক্ষমতার ক্ষেত্রকে, এমনকি সৃজনধর্মী ক্ষমতাকেও, বিস্তৃত করা যায় বহু দূর। তাই উপকরণ, আরো উপকরণ, উন্নত উপকরণে সমৃদ্ধ গবেষণাগার, এটিই হল পশ্চিমী বিজ্ঞান গবেষণার পরিবেশ। বিপরীতে, বসু তড়িৎ-তরঙ্গের অপবর্তন বা পোলারাইজেশন দেখিয়েছিলেন সাধারণ পাটের তন্তুর সাহায্যে, আর এ ছাড়া, হাতের কাছে পাওয়া একটি রেলের টাইম-টেব্‌ল বইয়ের সাহায্যে। তাঁর মনে হয়েছিল, আলোক-তরঙ্গের বেলায় একটি কেলাসিত পদার্থের আণবিক শৃঙ্খল যে ভূমিকা পালন করে, তড়িৎ-তরঙ্গের বেলায় একটা পাটের তন্তু বা বইয়ের পাতারও সেই একই ভূমিকা থাকা সম্ভব। স্বভাবতই, বসুর এই পরীক্ষণ-প্রকরণ পশ্চিমী গবেষকদের তারিফ কুড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সব খ্যাতিমান গবেষকদের পক্ষে বসুকে তাঁদের নিজেদের অভিজাত ক্লাবের ভিতরকার একজন বলে মনে করা সম্ভব ছিল না।

মানসিকতার এই অমিল জগদীশচন্দ্রকে অনেকটাই স্বতন্ত্র করে রেখেছিল তাঁর সময়কার অন্য গবেষকদের থেকে - পশ্চিমী বিজ্ঞানের অনেক রথী-মহারথী তাঁর প্রতিভার কদর দিয়েছিলেন যথেষ্টই, কিন্তু ভিতরের ভাবখানা অন্তত কিছুটা ছিল এরকম, 'গ্রাম' থেকে আসা মানুষ, যা করছে ঢের করছে, ওর প্রতিভার ও কাজের স্বীকৃতি দেওয়া যাক। কারণ তাঁরা জানতেন, যাকে উন্নত গবেষণা বলা হয় তার উপযোগী পরিকাঠামো বসু পাবেন না কোনদিনই।

জগদীশচন্দ্রের মত সংবেদনশীল মনের মানুষের এই পিঠ-চাপড়ানি মনোভাব বেশী দিন ভাল না লাগারই কথা। তার ওপর তিনি নিশ্চই বুঝেছিলেন, স্বীকৃতিও তিনি পাচ্ছেন না সে ভাবে, আর ভবিষ্যতে পাবেনও না ঠিক মত। কারণ স্বীকৃতির রসায়ন আবার ভিন্ন। এর জন্য কিছুটা দরকার, প্রধান ব্যক্তিকে ঘিরে এক উপযুক্ত গোষ্ঠী, যারা গবেষণা-সংক্রান্ত স্বার্থের বন্ধনে বাঁধা সেই প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে, এবং যারা তাঁর গবেষণার কাজকে আরো বিস্তৃতি ও পরিচিতি দেবে। এর জন্য দরকার অন্যান্য সুপরিচিত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এক ধরনের লেন-দেনের সম্পর্ক, এমনকি, কিছুটা দরকার পাকা খেলোয়াড়ের দক্ষতায় গুঁটি

সাজানো। আর দরকার প্রাতিষ্ঠানিক দাক্ষিণ্য-এক কথায়, রসদ। পশ্চিমী মহলের প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদেরকে এ সব নিয়ে আলাদা করে তেমন ভাবতে হয় নি কারণ তাঁদের বেলায় একটা উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল আগে থাকতেই, অনেকটা ঐ পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই। বিপরীতে, পুঁজিবাদের বৃত্তের বাইরে থেকে আসা বিজ্ঞানীরা ছিলেন যেন অনেকটা 'বহিরাগত' -অনেক সর্তের গণ্ডী পেরিয়ে যাঁদেরকে পেতে হত সেই সোনার কাঠির স্পর্শ যার নাম স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি লাভের এই খেলা খেলতে গিয়ে অবসন্ন বোধ করারই কথা প্রতিভাধর, সংবেদনশীল মনের। একদিকে, স্বীকৃতি দরকার ব্যক্তিগত চরিতার্থতার জন্যও কিছুটা, আর গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থেও কিছুটা। অন্য দিকে আবার স্বীকৃতি লাভের প্রয়াসেই বাধা পায় প্রতিভার অবাধ স্ফূরণ, যন্ত্রণায় দীর্ণ হয় বিজ্ঞানী-মন। বিশেষত, পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতিতে মানুষের কাছে স্বীকৃতি যতটা সহজ, স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে তা নয়। বিজ্ঞানী তাঁর প্রতিভার বিনিময়ে যশ ও অর্থ লাভ করবেন, পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রাচ্যের প্রাক্-পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে 'সাধনা' যেন যশ ও অর্থের উর্ধের ব্যাপার, যশের স্পর্শে কলুষিত হয় সাধনা। তাই ব্যবসায়ী সংস্থা যখন তড়িৎ-তরঙ্গের প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র বাবদ জগদীশচন্দ্রকে আর্থিক প্রস্তাব দেয়, তখন তা প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। অথচ তারই পাশাপাশি আবার, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির জন্য ঔপনিবেশিক প্রশাসকের কাছে দরবারও করতে হয় তাঁকে।

তবে মোটের উপর বসুর প্রথম পর্বের কাজকে পশ্চিমী বিজ্ঞান-গবেষণার মূল স্রোতের অংশ বলে ভাবলে ভুল হবে না। এই পর্যায়ের গবেষণায় এক দিকে যেমন মৌলিক চিন্তায় বসুর প্রতিভা সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তেমনই আবার তাঁর এক প্রবল নিজস্বতারও ছাপ পড়েছিল, যা পুঁজিবাদের সঙ্গে গ্রথিত গবেষণার মানসিকতার তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। তাঁর গবেষণা পশ্চিমী বিজ্ঞানী মহলের প্রশস্তি কুড়োলেও জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে কেন্দ্র করে কোন গবেষণা-গোষ্ঠী গড়ে উঠল না, যার প্রচেষ্টায় তাঁর কাজ ঢুকে পড়বে তৎকালীন বিজ্ঞান-গবেষণার মূল স্রোতের ভিতর। ফলত, জগদীশচন্দ্র রয়ে গেলেন অসাধারণ প্রতিভাবান কিন্তু নিঃসঙ্গ এক গবেষক। তাঁর কাজকে তাই স্বীকৃত বিজ্ঞান বা নর্মাল সায়েন্স বলে চিহ্নিত করা গেলেও তারই ভিতর আবার কোথায় যেন ছায়াপাত ঘটেছিল আগামী দিনের। তাঁর বিখ্যাত রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন বক্তৃতার (1897) শেষে বসু নিজেই ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন, তিনি এক ভিন্ন কৃষ্টির, ভিন্ন স্রোতের মানুষ। মানব-জ্ঞানের অগ্রগতির পথে সুদূর অতীতে প্রাচ্য দেশ যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল আগামী দিনেও মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তা।

এই ভূমিকা পালনের সুযোগ্য অংশীদার হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই বিজ্ঞান-সাধনার যাত্রা শুরু করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। এইটই ছিল তাঁর মতাদর্শের এক নিয়ামক উপাদান। বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর *ভারতীয়ত্ব* এক অর্থে ছিল তাঁর নিজেরই সযত্ন-লালিত বাসনা।

ছয়।

বসুর গবেষণা-জীবনে এর পরবর্তী পর্ব বস্তুত এক বিচিত্র অধ্যায়। এটা বুঝতে হলে বসুর দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণায় 'সদৃশতা' ও 'ঐক্য', এই দুটি বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে হবে। এটি আসলে এক বৃহত্তর দর্শনের ব্যাপার, আবার ব্যক্তি-বিজ্ঞানীর মতাদর্শেরও ব্যাপার। বসু তাঁর গবেষণায় একটি বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে ভিন্ন কোন ক্ষেত্রের অপর বিষয় বা ঘটনার সাদৃশ্য অনুসরণ করে নতুন এক ধারণা বা উদ্ভাবনের দিকে এগোনর ব্যাপারে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন, তাঁর গবেষণার প্রথম পর্যায়ে আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে তড়িৎ-তরঙ্গের সাদৃশ্য অনুমান করে তিনি এগিয়েছিলেন বহু দূর, এবং রশ্মি-ধর্ম ও তরঙ্গ-ধর্মের দ্বৈত সম্পর্কের তাত্ত্বিক গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত বোধ করেন নি তিনি।

আবার, সাদৃশ্য আর ঐক্যের ভিতর সীমারেখাটিও খুব সূক্ষ্ম ও আবছা। যেমন, আলোক-তরঙ্গ আর তড়িৎ-তরঙ্গ কি পরস্পরের সদৃশ, না কি তাদের ভিতর রয়েছে এক মৌলিক ঐক্য? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু প্রসঙ্গ-নির্ভর। যেমন, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এ দুইয়ের সদৃশতাকে বস্তুত গভীরতর স্তরে এক ঐক্যের প্রকাশ বলেই ধরতে হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়েছে ততই দেখা গেছে, একটা পর্যায়ে যা ছিল শুধুমাত্র সদৃশতা সেটাই পরের পর্যায়ে এ ভাবে হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন এক গভীরতর ঐক্যের দ্যোতক। বস্তুত, বিশ্বজগতের সব কিছুর ভিতরই এক সুগভীর ঐক্যের অনুসন্ধান, এটি দর্শনের এক চিরায়ত প্রসঙ্গ। বিজ্ঞান-গবেষণার অন্তরালে থেকে যে অধিজ্ঞান বা মেটাফিজিক্স অনেক সময় অভিভাবকের মত চালিত করে বিজ্ঞানকে, সেটিও অনেক সময় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঐক্যের দেখা পেলে।

অধিবিজ্ঞান আর ব্যক্তি-বিজ্ঞানীর মতাদর্শ, এ দুটিও আবার পরস্পরের খুব কাছাকাছি। একে অপরের হাত ধরে অন্তরালের জগৎ থেকে এরা চালিত করে বিজ্ঞানীর গবেষণা-কর্মকে। এক জটিল ও অতি সূক্ষ্ম ত্রিকোণ প্রেমের খেলা চলে মতাদর্শ, অধিবিজ্ঞান, আর বিজ্ঞানের ভিতর। আর ত্রিকোণ প্রেমের মতই,

এর পরিণতি হয় এক এক সময়, দুঃখজনক।

জগদীশচন্দ্রের সদৃশতা-সন্ধান থেমে থাকে নি আলোক-তরঙ্গ ও তড়িৎ-তরঙ্গের পরিসরের ভিতর। তড়িৎ-তরঙ্গের সংগ্রাহক বা রিসিভার রূপে তিনি কাজে লাগান গ্যালেনা নামক খনিজ পদার্থকে কারণ তিনি সম্ভবত জানতেন, এই পদার্থটির বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা এমন ধরনের যে সেটির সাহায্যে অতি-ওহ্‌মীয় বা নন্‌-ওহ্‌মিক বৈদ্যুতিক স্পর্শ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বস্তুত, গ্যালেনার অর্ধ-পরিবাহী ধর্মের এই সফল প্রয়োগ জগদীশচন্দ্রের এক অসাধারণ কীর্তি। শুধু অর্ধ-পরিবাহী ধর্মই নয়, গ্যালেনার আলোক-উদ্দীপিত পরিবহন-ক্ষমতা বা ফটো-কন্‌ডাক্‌টিভিটি ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তিনি তৈরী করেছিলেন 'নকল অক্ষিপট' বা আর্টিফিসিয়াল রেটিনা যা শুধু তড়িৎ-তরঙ্গেরই নয়, আলোক-তরঙ্গের বা এমনকি অবলোহিত ও তাপ-তরঙ্গেরও সংগ্রাহক রূপে কাজ করবে। সীসার খনিজ নির্মীত এই নকল অক্ষিপট একটি জড়-পদার্থ হয়েও আসল অক্ষিপটের মতই বা তার চাইতেও ভাল সাড়া দেয় বাইরে থেকে আসা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের প্ররোচনায়। তবে কি জীব ও জড়ের ভিতরকার পার্থক্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে গভীরতর এক ঐক্য, যা ধরা পড়ে নি আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে ও দর্শনে?

অনাদি অতীত থেকেই প্রাচ্যের দর্শন বলে এসেছে, প্রকৃতির সকল ভিন্নতা, বিরোধ, ও বৈপরীত্যকে অতিক্রম করে কোন এক চূড়ান্ত সীমায় লীন হয়ে আছে এক অপার ঐক্য। তবে ত জড় জীবের ভিন্নতা এক অবয়বগত ভিন্নতা ছাড়া আর কিছু নয় - কোন এক বিমূর্ত ঐক্যের মূর্ত রূপ পরিগ্রহণ মাত্র।

শুরু হল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়। কিন্তু এবারে তাঁর অধিবিজ্ঞান, তাঁর ভারতীয়ত্ব, তাঁর মতাদর্শ, চলে এল সম্মুখ সারিতে, দখল করে বসল চালকের স্থান। জগদীশচন্দ্র প্রকৃতই নিজেকে বিজ্ঞানের আঙিনায় প্রাচ্যের দূত বলে ভাবতে সুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার প্রশস্তি ও উৎসাহ-দান সম্ভবত সমর্থন জুগিয়েছিল এই মনোভাবের। এত দিন যা ছিল অন্তর্লীন ধারণার জগতে, তাঁর নিজেরই চেতনার অন্তরালে, আজ সম্পূর্ণ হল তার অজ্ঞাতবাস। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণাকে চালিত করলেন তাঁর মতাদর্শের দেখানো পথে।

গবেষক যতদিন মেতে থাকেন নিজের খামখেয়ালের খেলায়, অজানা পথে চলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে খুঁজে বেড়ান ততোধিক অজানা পরশ-পাথর, তাঁরই অন্তর্লীন ধারণার জগৎ থেকে কে কি ভাবে চালাচ্ছে তাঁকে, তা নিয়ে যতদিন মাথাব্যথা থাকে না তাঁর, তত দিন তাঁর আনন্দের ধারায় উৎসারিত হতে থাকে বিজ্ঞানের নব নব অবদান। হ্যাঁ, যশ, প্রশস্তি, অর্থ, এ সবই এসে মাঝে মধ্যে গ্রাস করতে চায় বৈকি গবেষকের সাধনাকে, কিন্তু যে গবেষক প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন তাকে, নিজের অন্তর্লীন ধারণার জগৎটির প্রতি আনুগত্যে অবিচল থেকে অনুসরণ করে চলেন তার নীরব ও নিগূঢ় নির্দেশ, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধকাম হন তিনিই। আর, ঐ অন্তর্লীন ধারণার জগৎ থেকে বেরিয়ে যদি গবেষকের মতাদর্শ উৎসাহের বশে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁর গবেষণাকে, তখনই ঘটে বিভ্রাট।

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের গবেষণা কি পড়েছিল এই বিভ্রাটেরই কবলে? জগদীশচন্দ্র দেখাতে চেয়েছিলেন, বাইরে থেকে আরোপিত উদ্দীপনা বা প্ররোচনায় জড় ও জীবের সাড়া মূলগত ভাবে সদৃশ, এবং এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছিলেন, জড় ও জীবের আপাত-প্রভেদের আড়ালে রয়েছে এক মৌলিক ঐক্য। ইতিহাস কি ভাবে মূল্যায়ণ করবে তাঁর এই কাজের? একে কি বিজ্ঞানের জগতে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার এক বিরল মৌলিক অবদান বলে ধরা হবে, না কি, এটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে এক *স্খলিত* প্রতিভার বিয়োগান্তক প্রকাশ রূপে?

বিশেষজ্ঞদের মত ধরে যদি চলতে হয় তবে স্বীকার করতেই হবে, বসুর এই পর্বের গবেষণা চিরতরে নির্বাসন লাভ করেছে ঐ দ্বিতীয় মূল্যায়নের হিমঘরে। আর, এর সম্ভাব্য কারণ যদি নির্দেশ করতে হয় ত বলতেই হবে, বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার চাইতে মতাদর্শকে বেশী প্রাধান্য দেওয়ারই ফলে আংশিক গ্রহণ লেগেছিল জগদীশচন্দ্র নামক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিতে।

নকল অক্ষিপট সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি বসু রয়াল সোসাইটির প্রত্রিকায় প্রকাশের জন্য পেশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি সেটি, কারণ রয়াল সোসাইটির মনোনীত দুই বিশেষজ্ঞ সেটির পক্ষে মত দেন নি। এর আগে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে যে সব গবেষণাপত্র পেশ করেছিলেন তার অধিকাংশই প্রকাশনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন স্বয়ং লর্ড রেলে, যিনি ছিলেন তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। এই গবেষণাপত্রটিতেই বসু প্রথম পদার্থবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানের ভিতর এক সেতুবন্ধনের কাজে নামলেন, এবং তাঁর এই কাজের মূল্যায়নের জন্য মনোনীত হলেন তখনকার দুই প্রখ্যাত জীবন-বিজ্ঞানী। বসু দৃষ্টি-ক্ষমতার যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন ঐ গবেষণাপত্রে, তাঁদের পছন্দ হয় নি সে ব্যাখ্যা।

আসলে বসু কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব প্রায়-অলৌকিক অর্ন্তদৃষ্টির উপর নির্ভর করে নেমে পড়েছিলেন এক নতুন জগতে, তাও আবার নতুন পথের দিশারী হয়ে। জীবনবিজ্ঞানে তৎকালীন গবেষণার মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সামান্যই। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধগুলিতে এই

অপরিচয়ের ছাপ থাকত সর্বত্র। ফলত, জীবনবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা তাঁকে বহিরাগত বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন, এবং জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর 'উচ্চাশা' দেখে বিরক্তি বোধ করছিলেন প্রথম থেকেই। বসুর পরবর্তী কয়েকটি বক্তৃতা ও গবেষণা-নিবন্ধ থেকে তাঁদের এই বিরক্তি বেড়ে গেল আরো অনেকটাই। বসু তাঁর এই দ্বিতীয় পর্বের গবেষণার বিষয়বস্তু বা মূল প্রতিপাদ্য বলে যা উপস্থিত করলেন তা, একথায়, উদ্ভট। বাইরে থেকে আরোপিত প্ররোচনা বা উদ্দীপনায় জীব ও জড়ের সাড়া মৌলিক বিচারে অভিন্ন প্রকৃতির, এবং ফলত, জড়ের ভিতরও জীবধর্ম বিদ্যমান-এই বক্তব্যকে শুধু একটা বেশ চিত্তাকর্ষক আপ্তবাক্য বলে না ধরে যদি একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্য বলে ধরতে হয় তবে এক বিশাল, সত্যিই বিশাল দায় বর্তায় প্রতিপাদ্যের প্রস্তাবকের উপর।

প্রস্তাবক কিন্তু সে দায় প্রায় এড়িয়েই গেলেন। অথবা, বলা চলে, তা পালন করলেন তাঁর একান্ত নিজস্ব কায়দায়, যা বিন্দুমাত্র অনুমোদন পেল না তাঁর পশ্চিমী সতীর্থদের কাছে। জড় ও জীবের সাড়া প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন বহু। তার সবগুলিতেই ছিল তাঁর নিজস্ব মৌলিকতার ছাপ, কিন্তু পরীক্ষণগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত টানার সময় তাঁর যৌক্তিক উল্লম্ফন তাঁর সতীর্থদের কাছে প্রায় হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জগদীশচন্দ্র যেন সব কিছুর ভিতরই তখন সন্ধান পাচ্ছেন জড় ও জীবের সাড়ার ভিতরকার অভিন্নতার, এবং প্রাণ-ধর্মের সর্বব্যাপিতার। তাই তাঁর সমালোচকরা তাঁর পরীক্ষণগুলির মৌলিকত্ব বিষয়ে একমত হয়েও, পরীক্ষণলব্ধ তথ্যগুলি যে খুবই ইঙ্গিতবহ তা মেনে নিয়েও, তাঁর গবেষণার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন প্রায় যেন এক সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের মত করে। জগদীশচন্দ্র অনেকটা অকথিত ভাবেই চিহ্নিত হয়ে গেলেন 'খ্যাপাটে বিজ্ঞানী' বলে।

সাত।

বসু যে শুধুমাত্র পশ্চিমী বিজ্ঞানী মহলেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন তাই নয়, স্বদেশেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ পথিক। তবে দুইয়ের ভিতর তফাৎ ছিল অনেকটাই। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার পর্যায়েও তাঁর মানসিকতা ও কাজের ধারার বিচারে পশ্চিমী মহলে তিনি একরকম বহিরাগত বলেই বিবেচিত হতেন, কিন্তু তখন মূল স্রোতের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অনেক বেশী, পেয়েছিলেন লর্ড রেলের মত বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন। আর স্বদেশে কিন্তু সেই গোড়া থেকেই তিনি ছিলেন একক ও বিচ্ছিন্ন। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জমিতে দাঁড়িয়ে তিনিই ত প্রথম নিজের ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা নিয়ে শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানের যাত্রা। কিন্তু গোলমাল যা দাঁড়িয়ে গেল তার কারণ ভিন্ন।

প্রথম থেকেই বসুর কাজের অন্যতম লক্ষ্য দাঁড়িয়ে গেল শুধুমাত্র বিজ্ঞান-গবেষণার মানের ভিত্তিতে স্বীকৃতি আদায় নয়, বস্তুত তাঁর স্বদেশ-ভূমির মর্যাদা বাড়ানো। তাঁর ভূমিকা যেন হয়ে দাঁড়ল এক স্বঘোষিত অহিংস দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বায়কের মত। বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবীন আগন্তুক হলেও প্রাচ্য-দেশের ঐতিহ্যের ও কৃষ্টির যে একটি সমুন্নত দিক রয়েছে, তারই জোরে তাঁর স্বদেশের স্বীকৃতি আদায়ের দাবী-সনদ হাতে নিয়ে আবির্ভূত হলেন জগদীশচন্দ্র। যে খেলার যা নিয়ম সে নিয়ম মেনে প্রতিকূল পরিবেশ দাঁতে দাঁত চেপে খেলার ফল নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টায় বদলে তিনি তাঁর নিজের মত করে একটু একটু করে বদলে নিতে লাগলেন খেলার নিয়ম গুলিকেই।

বস্তুত পরিস্থিতি যা দাঁড়াল তাকে এক কথায় বলা চলে খুবই অদ্ভুত, বা এমনকি, উদ্ভট। জগদীচন্দ্র তাঁর দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে এলেন উন্নত মানের বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্যে। এ কাজে তাঁর সহায় হল তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু শুধু গবেষণা করলেই চলবে না, চাই স্বীকৃতি। নিজের জন্য ব্যক্তিগত স্বীকৃতি নয়, চাই স্বদেশভূমির মহিমা ও মর্যাদার স্বীকৃতি। তার জন্য চাই বিজ্ঞান-গবেষণার এক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ, যা দেখিয়ে দেবে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করতে পারে প্রাচ্যভূমি। তা হলে পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞানাগার একটা সুবিধাজনক আঙিনা ছাড়া কিছু নয়, যেখানে পাওয়া যাবে গবেষণার উন্নত মানের সুযোগ-সুবিধা, আর যেখানে অর্জিত হবে স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি। বিজ্ঞান গবেষণা সে ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি লাভের একটা উপায়। রবীন্দ্রনাথ আগামী দিনে সাহিত্যকে অবলম্বন করে স্বদেশকে এনে দেবেন যে সম্মান, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে দায়িত্বই আজ বর্তেছে জগদীশচন্দ্রের উপর। তাই পরীক্ষণলব্ধ তথ্যকে ছাড়িয়ে যদি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত বহু বহু দূর এগিয়েও যায় তবু জগৎবাসীকে জানাতে হবে সে সিদ্ধান্ত, কারণ এ সিদ্ধান্তের উৎস হল তাঁর স্বদেশভূমির এক সমুন্নত সংস্কৃতি। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় গবেষণার স্বীকৃতি পদ্ধতি-প্রকরণ থেকে কম-বেশী বিচ্যুতি, ক্ষতি কি, কারণ শেষ বিচারে সেগুলি ত কিছু শুকনো নিয়মতন্ত্র মাত্র।

যে ভাবে বলছি, তা নিশ্চই এক অতিসরলীকরণ। বসুর চিন্তায় যদি এ ধরনের কোন পরিবর্তন বা বিপর্যয় ঘটেও থাকে তবে তা অবশ্যই ঘটেছিল সকলের অলক্ষ্যে, এমনকি তাঁর নিজেরও

অগোচরে, তাঁর মনোজগতের এক সূক্ষ্ম ও বিসর্পিল পথ ধরে। স্বীকৃতি চাইছি পাশ্চত্ত্য বিজ্ঞানী মহলের (বস্তুত, এই চাওয়াটা ক্ষেত্রবিশেষে পৌঁছে গেছে প্রায় এক অকুলতার পর্যায়ে), চাইছি বিজ্ঞান-গবেষণার নতুন অবদান রাখার মধ্যে দিয়েই, অথচ সেই বিজ্ঞানী মহলের স্বীকৃত নিয়মতন্ত্রকেই অগ্রাহ্য করছি - এর ভিতর যে প্রবল স্ববিরোধ, তা বোঝার মত ধীশক্তি জগদীশচন্দ্রের ছিল না, একথা পাগলেও বলবে না। আসলে কিন্তু এটা ঠিক ধীশক্তির ব্যাপার নয়, ধীশক্তির অন্তরালে থাকা অন্তর্লীন ধারণার জগতের ব্যাপার। যে মতাদর্শ এত দিন এক অলক্ষ্য ও অগোচর উপাদানের কাজ করছিল, তার ভূমিকা বদলের ব্যাপার। আর এই ভূমিকা বিপর্যয়ের শিকার যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একমাত্র জগদীশচন্দ্রই হয়েছেন, এমনও নয়।

হ্যাঁ, বলা যেতেই পারে, ঐ সব নিয়মতন্ত্র বেঁধে দিয়েছেন পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী মহল। বিজ্ঞান গবেষণার একটাই মাত্র নিয়মতন্ত্র থাকতে হবে, এ কথা কে বলে দিল? স্বীয় প্রতিভার জোরে সে নিয়মতন্ত্র ভেঙে, বা এমনকি না ভেঙেও, নতুন বা অন্য কোন এক নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কেউ ত করতেই পারেন। হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারেন। কিন্তু তা হলে আর সেই বিজ্ঞানী মহলের স্বীকৃতি পাওয়াটা বড় লক্ষ্য হলে চলবে না - এমনকি, সে স্বীকৃতি যদি নিজের জন্য না হয়ে স্বদেশভূমির জন্য হয়, তবুও। এই প্রবল স্ববিরোধের আবর্ত থেকে জগদীশচন্দ্র মুক্ত হতে পারেন নি কোনদিনও।

> *আমিও কি তবে আক্রান্ত হলাম জগদীশ-জ্বরে? অনুমানের ওপর ভিত্তি করে লাফ দিয়ে দিয়ে এত দূর এসে গেছি যে আর ত ফেরার পথ নেই। তা হলে চলতে থাকুক এই লাফ।*

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষণগুলি সুবিদিত ছিল মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে। সেগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের পরিসরের ভিতর যদি তিনি নিজেকে সমীবদ্ধ রেখে ধাপে ধাপে গড়ে তুলতেন তাঁর গবেষণার ইমারতটিকে তবে কি হত বলা যায় না। যেমন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং যান্ত্রিক প্ররোচনায় ধাতব পদার্থের সাড়া, আর ধাতব 'ক্লান্তি' বা ফেটিগ সংক্রান্ত পরীক্ষণগুলি থেকে পাওয়া নানান তথ্য ছিল খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। অনুমান করা যেতে পারে, ধাতব পদার্থের পরাস্থাপকতা বা প্লাস্টিসিটি ধর্মের নানান ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব চিল ঐ সব তথ্য থেকে। আবার তড়িৎ-প্ররোচনায় যান্ত্রিক সাড়া বা যান্ত্রিক প্ররোচনায় তড়িতীয় সাড়া, এই ধরনের অপরাধর্মী ক্রিয়া সম্পর্কেও বহু তথ্য সম্ভবত পাওয়া যেত সেগুলি থেকে। জগদীশচন্দ্রের সময়ের আগে থেকে আজ পর্যন্ত এই সব নানান অপরাধর্মী ক্রিয়া পদার্থবিজ্ঞানের এক বিশাল ও গুপুত্বপূর্ণ শাখা। বসু কিন্তু ধার দিয়ে গেলেন না সে সবের বা অন্য কোন তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গঠনের। তিনি এ গুলির ভিতর খুঁজে পেলেন *প্রাণের* আভাস।

প্রাণীর স্নায়ুকোষে যে তড়িৎ-স্পন্দন সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে ধাতব পদার্থের তড়িতীয় সাড়ার সাদৃশ্য দেখে এক বিশাল যৌক্তিক উল্লম্ফন ঘটালেন চিরদিনের সাদৃশ্য-সন্ধানী জগদীশচন্দ্র। স্নায়ু-কোষের প্রাচীরে প্রোথিত প্রোটিন অণুর সক্রিয়তার অনুরূপ কোন ক্রিয়া ধাতব পদার্থের বেলায়ও সংঘটিত হয় কি না, কিংবা অন্য কোন সূত্র ধরে উভয়ের কার্য-কারণগত কোন মিল আছে কি না সে সব অনুসন্ধানের ভিতর গেলেন না তিনি। তাঁর খুব প্রিয় একটি তত্ব ছিল, যার নাম দেওয়া যায় আণবিক পুণঃ-সংগঠনের তত্ব। এটি তিনি উদ্ভাবন করেন স্বল্প-দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-তরঙ্গের এক বিশেষ ধরনের সংগ্রাহক যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। যন্ত্রটির নাম ছিল কোহেয়ারার। এই যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার ব্যাখ্যার ঐ তত্ত্বটি তখনও ছিল একটু বেখাপ্পা ধরনের। কিন্তু ঐ আলগা তত্ত্বটিকেই এখনও অবলম্বন করে রইলেন তিনি। একের পর এক যৌক্তিক উল্লম্ফন ঘটাতে ঘটাতে পৌঁছে গেলেন প্রাণ-ধর্মের সর্বব্যাপিতার তত্ত্বে। পশ্চিমী বিজ্ঞানী মহলে বসু চিহ্নিত হয়ে গেলেন ঈষৎ ছিটগ্রস্ত এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বলে। তাঁর গবেষণা-জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বটি চিহ্নিত হয়ে রইল এক স্খলিত প্রতিভার অ-চরিতার্থ বিজ্ঞান-অনুসন্ধানের পর্যায় রূপে।

স্বদেশের পরিস্থিতি জগদীশচন্দ্রের পক্ষে হয়ে দাঁড়াল আরো ক্ষতিকর। রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত, এই সব বিশাল ব্যক্তিত্ব জগদীশচন্দ্রের পাশে দাঁড়ালেন, তাঁকে যথাসাধ্য সহায়তা যোগালেন, এবং তা তাঁরা করলেন খুব সঙ্গত কারণেই। জগদীশচন্দ্র সত্যিই আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন প্রথম *ভারতীয়* প্রতিনিধি রূপে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভিতর দেখেছিলেন এক অনন্য সম্ভাবনা। বিজ্ঞানের পথিক না হয়েও রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি হয়েছিল একমাত্র এই কারণে যে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তবে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীদের এই জগদীশ-বন্দনা কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পক্ষে জন্ম দিল এক বিপরীত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার। এক দিকে, দেশের ভিতর তৈরী হল তাঁর প্রতি এক *ব্যক্তি-পূজার* পরিমণ্ডল - স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে আচার্য বলেছেন তিনি ছাড়া পূজার যোগ্য আর কে? আর জগদীশচন্দ্র *নিজে* সম্ভবত আরো বেশী করে ভাবতে লাগলেন যে তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছেন বিজ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে প্রাচ্য-দেশের সংস্কৃতি ও দর্শন প্রতিষ্টার দায়িত্ব নিয়ে।

গবেষণা যখন ভিন্ন কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় তখনই তা হারিয়ে বসে স্বতঃস্ফূর্ততা। অন্তর্লীন ধারণার জগতের যে উপাদান এতদিন প্রচ্ছন্ন থেকে সৃজনী প্রতিভাকে যুগিয়ে আসছিল তার প্রাণশক্তি, তা এখন হয়ে দাঁড়ায় গবেষকের এক সচেতন প্রয়াস, আর তার পাওনা মেটাতে গিয়ে অনেক সময় বিশুষ্ক হয়ে আসে সৃজনশীল চিন্তার ধারাটি। বসু যদি জড় ও জীবের আপাত-ভিন্নতার অন্তরালে মৌলিক ঐক্য সন্ধানে এবং প্রাণ-ধর্মের সর্বব্যাপিতার সন্ধানে এত ব্যস্ত না হয়ে তাঁর নিজের গবেষণার অন্তর্বস্তুতে মগ্ন হতেন আরো বেশী করে তবে হয়ত তাঁর পরীক্ষাণলব্ধ তথ্যগুলি দিতে পারত আরো অনেক মৌলিক সম্ভাবনাময় পথের দিশা - প্রকৃত অর্থে চরিতার্থ হত তাঁর গবেষণা।

আসলে মৌলিক গবেষণা কিন্তু শুধু কিছু বিমূর্ত চিন্তা ও ধারণা নয়। ভাসা ভাসা নানান বিমূর্ত ধারণা গবেষকের মানসপটে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ক্রমাগতই। তবে তার সবগুলিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য রূপ পায় না। এখানেই এসে পড়ছে বিজ্ঞান-গবেষণার দুটি পর্যায়ের প্রসঙ্গটি - প্রথম পর্যায়ে প্রকল্প গঠন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে সেটিকে তন্ন তন্ন করে যাচাই করা এবং প্রয়োজনে নাকচ করা। স্পষ্টতই এই হল সেই বহু-আলোচিত প্রকল্প-গঠন বনাম খণ্ডন বা নাকচনের দ্বিমুখী সম্পর্কের প্রসঙ্গ। শুধু প্রকল্প গঠন করলেই ত আর হয় না, তাকে সম্ভাব্য নানান পরীক্ষণ, যৌক্তিক বিশ্লেষণ, ও যাচাইয়ের ভ্রুকুটি-কুটিল পথ পেরিয়ে তবে অর্জন করতে হবে সাময়িক স্বীকৃতির শংসাপত্র, আর তার পরও ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হবে নিরন্তর, এই বুঝি নতুন কোন আগন্তুক কেড়ে নিল তার সেই সংশয়িত স্বীকৃতির আসনটি। প্রকল্প-গঠন, বলা চলে, ধ্যানমগ্ন সাধনার শেষে এক মুহূর্তের 'ঈশ্বরদর্শন', কিন্তু তার পরের পর্যায়েটিই দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য, এবং অনেক সময়ই হতাশাব্যঞ্জক। ঈশ্বরদর্শন অনেক সময়ই বড় বিপজ্জনক, যদি না সে ঈশ্বরকে অণুবীক্ষণের নিচে ফেলে যাচাই করে নেওয়া হয় শল্যচিকিৎসকের নিরপেক্ষতায়। এই যাইয়ের কাজ করেন কে? বস্তুত, যাচাই করে একটা গোটা সংস্কৃতি।

আট।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, যে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের প্রকল্প গঠন করেছিলেন, সেই তিনিই একা হাতে যুগিয়েছিলেন সে প্রকল্পের যৌক্তিক প্রমাণ। এ কথা ত অনস্বীকার্য যে আইনষ্টাইন সত্যিই প্রায় একা হাতে নির্মাণ করেছিলেন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ইমারতটি, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাঁর সে কীর্তির ভাস্বরতায় অনেকটা ঢাকা পড়ে গেলেও আপেক্ষিকতা তত্ত্বের নির্মাণে যুক্ত হয়েছিল আর বহু গবেষকের প্রচেষ্টা, সহায়তা, সহযোগিতা এবং সমালোচনা। এক কথায় আইনষ্টাইনের একক কীর্তিও তাঁর সময়কার বিজ্ঞান ও গণিতের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বিজ্ঞানের জগতে আইনষ্টাইন সর্বদাই এক সাংস্কৃতিক লেন-দেনের অংশীদার ছিলেন, তাঁর বিশাল মর্যাদার অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও কোন এক ঊর্ধতর সংস্কৃতির একক দেবতা হয়ে ওঠেন নি তিনি।

জগদীশচন্দ্রের হয়ত দুর্ভাগ্যই, তাঁর স্বদেশে তিনি কিন্তু প্রায় ঐ একক দেবতার মাহাত্মেই মণ্ডিত হয়েছিলেন। বিদেশে কোন গবেষণা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন নি তিনি, সেখানে তিনি হয়ে রইলেন এক প্রকার বহিরাগত। আর স্বদেশেও তাঁকে ঘিরে গরে ওঠে নি কোন সহযোগী বা সহকারী গোষ্ঠী, কারণ স্বদেশে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একক দেবতা, এক ঊর্ধলোকের আচার্য, যাঁর কাজ, বিদেশের বিজ্ঞানী মহলকে বিস্ময়-বিহ্বল করে প্রাচ্য সংস্কৃতির মহাত্ম প্রতিষ্ঠা। তাঁরও যে আবার সহযোগী বা সহকারী প্রয়োজন হতে পারে, তাঁরও যে প্রয়োজন হতে পারে একটা সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে নিরন্তর লেন-দেন, সে কথার কোন প্রাসঙ্গিকতাই তৈরী হয় নি তাঁর স্বদেশের পরিমণ্ডলে। তিনি বড় জোর কোন কারিগরকে দিয়ে তৈরী করিয়ে নেবেন কোন যন্ত্রাংশ। কিন্তু তিনি কোন সহযোগী বা সহকারীর সঙ্গে আলোচনা করবেন তাঁর কাজের খুটিনাটি নিয়ে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি-সঞ্জাত অনুমানগুলিকে ধরে সেই সহযোগীরা তন্ন তন্ন করে যাচাই করবেন ঐ অনুমান-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে, সেগুলিকে সেই সময়ের গবেষণার মূল স্রোতের সঙ্গে তুলনা করে তাদের তাৎপর্য নিরূপণ করবেন, এবং বহু ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর দাঁড় করাবেন কিছু মজবুত সিদ্ধান্ত - এত সব কথা সম্ভবত ভাবতেই পারেন নি তাঁর সময়কার মানুষজন।

তাই জগদীশচন্দ্র একের পর এক হাজির করতে থাকলেন চমকপ্রদ সব অনুমান, গঠন করলেন অসাধারণ সম্ভাবনাময় নানান প্রকল্প, কিন্তু সেগুলির নিরপেক্ষ *বিশ্লেষণ* ও *যাচাই* কিন্তু আর হতে পারল না। যে টুকু হল সেটুকুও করলেন তিনি নিজে হাতেই। তাঁর গবেষণার প্রথম পর্বে এই নিজে হাতে যাচাইয়ের ব্যাপারটা অনেকটাই কাজ দিয়েছিল, কারণ তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র ও বিষয়গুলি ছিল তুলনায় অনেক সুনির্দিষ্ট, এবং সেই ক্ষেত্রের গবেষণার মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল অনেক নিবিড়। কিন্তু তার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে যখন তিনি পদার্থবিজ্ঞান আর জীবনবিজ্ঞানের সেতুবন্ধন ঘটাতে গেলেন তখন তাঁকে নামতে হল একদম গভীর ডুবজলে, যার থৈ পাওয়া তাঁর একার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না।

বসুর বিদেশী সতীর্থরা যখন তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কাজের আশানুরূপ মূল্য দিলেন না, তখন বসু কিন্তু তাঁরা যে ধরনের

নিয়মতন্ত্র দাবী করছেন সেই অনুযায়ী তাঁর গবেষণার অভিমুখ পরিবর্তিত করার বদলে অনেকটা যেন জেদের বশেই আঁকড়ে ধরে রইলেন তাঁর নিজস্ব গবেষণা-রীতিকে। তবু, তাঁর গবেষণা-প্রকরণের অনন্যসাধরণ স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, তিনি কিন্তু ক্রমশ বেশী করে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেন তাঁর সতীর্থ-সমালোচকদের থেকে। আর, তার বিপরীতে তাঁর প্রকল্পগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন ছিল, স্বদেশে তেমন কোন সহকারী গোষ্ঠীও গড়ে উঠল না তাঁর। তাই নিরপেক্ষ যাচাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর পরীক্ষণ-লব্ধ নানান তথ্য থেকে মজবুত ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গঠনের প্রক্রিয়াটি কার্যকর হতে পারল না কোনদিনই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক দুঃখজনক অধ্যায়।

আমি এ কথা বলছি না যে যাচাই ও বিশ্লেষণ হলেই বসুর অনুমানগুলি সব গ্রহণযোগ্য রূপ পেত। হয়ত দেখা যেত, অনুমাণগুলি ঠিক সে ভাবে সমর্থিত হচ্ছে না। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব ছিল যে ঐ অনুমাণগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ ভিন্ন এক গুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে সে প্রক্রিয়াটি থেকে। বিজ্ঞান-গবেষণার প্রায়শই এটাই হয়ে থাকে। বিশেষত সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে অনুমানগুলি হাজির করছেন যে বিজ্ঞানী তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ম। আর, বসুর সমালোচকরাও স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর পরীক্ষণ-লব্ধ তথ্যগুলি অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ। এ প্রসঙ্গে আমি আবার আইনষ্টাইনের উল্লেখ করব।

এ কথা সাধারণভাবে জানা আছে যে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আইনষ্টাইন মনের থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি কোনদিনই, যদিও এই তত্ত্বের প্রথম পর্বের প্রতিষ্ঠাতাদের ভিতর তিনি ছিলেন অন্যতম। কোয়ান্টাম তত্ত্বে প্রকৃতির রাজ্যে এক ধরনের মৌলিক অনিশ্চয়তার নীতি সূচীত হয়, এই ছিল তাঁর আপত্তির কারণ। বোর এবং সেই সময়কার তরুণ বিজ্ঞানীরা আইনষ্টাইনের এ আপত্তি মেনে নেন নি, এবং বস্তুত আইনষ্টাইন সেই সময়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের গবেষণার মূল স্রোত থেকে নিজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন - অথবা বলা চলে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

এ পর্যন্ত বসুর সঙ্গে একটা আপাত মিল চোখে পড়ে। বসু ও আইনষ্টাইন, উভয়েরই তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু আইনষ্টাইন যেখানে সর্বদাই পেয়ে এসেছেন এক সজীব সংস্কৃতির তৎপর সহযোগিতা, বসু সেখানে চিরদিনই রয়ে গেছেন নিঃসঙ্গ ও একক।

আইনষ্টাইন ছিলেন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের একদম অন্দরমহলের মানুষ। সে বিজ্ঞানের পদ্ধতি-প্রকরণ ও নিয়মতন্ত্র ছিল তাঁর নখদর্পণে, যদিও আবার এরই ভিতর তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যও ছিল লক্ষণীয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃষ্টিকোণকে মনের থেকে মেনে নিতে না পারলেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সেই সময়কার মূল স্রোতের সঙ্গে বরাবরই একটা কথোপকথন চালিয়ে এসেছিলে তিনি। এই কথোপকথন, যা ছিল প্রায় একটা চাপান-উতোরের মত, প্রধানত চলত বোরের সঙ্গে, কারণ বোরই ছিলেন সেই সময়কার কোয়ান্টাম তত্ত্বের নির্মীয়মান সংস্কৃতির প্রতিনিধি-স্বরূপ। আইনষ্টাইন শেষ পর্যন্ত তাঁর আপত্তির কারণগুলিকে একটা পরিষ্কার যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দিলেন সহকর্মী পোডলস্কি ও রোজেনের সঙ্গে লেখা এক গবেষণা-নিবন্ধে। এঁরা এঁদের বক্তব্য হাজির করলেন একটা কূট-প্রশ্ন বা প্যারাডক্স-এর আকারে, পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে যা ই-পি-আর কূট নামে বিখ্যাত।

এই ই-পি-আর কূট-এর সূত্র ধরেই কালক্রমে আত্ম-প্রকাশ করেছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনুসন্ধান ও গবেষণার এক নতুন ধারা[15] , যা থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠল কোয়ান্টাম তথ্য-বিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম ইনফরমেশন থিওরী। আইনষ্টাইনের কোয়ান্টাম-বিরোধিতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। তবে তাঁর অবস্থান নতুন প্রজন্মের কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি না পেলেও সেই অবস্থান প্রসঙ্গে তাঁর সহযোগী, সহকারী এবং এমনকি সমালোচকদের বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের ভিতর দিয়ে, এক কথায় একটা সজীব সংস্কৃতির সক্রিয়তায়, বেরিয়ে এসেছিল নতুন এক গুচ্ছ সিদ্ধান্ত। বসুর অনুমানগুলির বেলায় কিন্তু এ রকম কোন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় নি। হয় নি শুধু এই কারণে নয় যে বিজ্ঞানী মহলে বসুর মর্যাদা ছিল তুলনামূলক বিচারে অনেক কম, তার সঙ্গে এই কারণেও বটে যে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে নি কার্যকর কোন সহযোগী ও সহকারী গোষ্ঠী। তিনি কোনদিনই হয়ে উঠতে পারেন নি কোন এক সজীব সংস্কৃতির তৎপর অংশীদার। বিদেশে অবহেলিত হয়ে তাঁর নিজের দেশে এক একক ও নিঃসঙ্গ স্বপ্নদ্রষ্টা দেবতা হয়ে রইলেন জগদীশচন্দ্র।

কোন বিজ্ঞানীর কোন একটা অনুমান ঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে, সেটা কিন্তু সবসময় বড় কথা নয়। তবে মৌলিক ও সৃজনধর্মী চিন্তায় যাঁর সহজাত দক্ষতা এবং অধিকার রয়েছে তাঁর সে অনুমানের সন্ধানী-আলোয় প্রাণ পায় আরো নতুন নানান সিদ্ধান্তের বীজ, তৈরী হয় নতুন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। আর ঠিক এই কারণেই প্রয়োজন এক সজীব সংস্কৃতির উষ্ণ পরিমন্ডল - যেমনটা ছিল আইনষ্টাইনের বেলায়, আর, যে পরিমন্ডল কোনদিনই পান নি, হয় ত তেমন আগ্রহ নিয়ে পেতেও চান নি, জগদীশচন্দ্র।

আরো একজনের সঙ্গেও তুলনা টানা যেতে পারে। তিনি হলেন পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের

গবেষণা যেমন বিলীন হয়েছিল এক অ-চরিতার্থতার কুহেলীতে, অনেকটা তেমনই ঘটেছিল ভারতীয় বিজ্ঞানের আরো কয়েকজন মহারথীর বেলায়ও, যদিও অবশ্য প্রত্যেককের ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ও ফলশ্রুতি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। এঁদের ভিতর সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস খুবই ইঙ্গিতবহ। কৃষ্ণ-বস্তু বিকিরণের শারীরতত্ব বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সাড়া-জাগানো কাজের সূত্রে ঐ একই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ আরো একটি গবেষণাপত্র পাঠিয়েছিলেন আইনষ্টাইনের কাছে, এবং দুটি নিবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল আইনষ্টাইনের সুপারিশে। তবে দ্বিতীয় নিবন্ধটির সঙ্গে আইনষ্টাইন তাঁর মন্তব্য যোগ করেছিলেন কিছু মতপার্থক্য জানিয়ে। আইনষ্টাইন যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তর তৈরী করেও তা প্রকাশের জন্য পেশ করেন নি। বস্তুত, এর পর সত্যেন্দ্রনাথ বিকিরণ ও পদার্থকণার তাপগতীয় সাম্য এবং সে সংক্রান্ত রাশিতাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে আর কোন গবেষণাপত্রই প্রকাশ করেন নি। আশ্চর্যভাবে বাঁক নিয়েছে তাঁর গবেষণার ধারা[16]। কৃস্টালের গঠন নির্ণয়ে এক্স রশ্মির প্রয়োগ, রসায়ন-বিজ্ঞান, আয়ন-মন্ডলে বেতার তরঙ্গের প্রবাহ, এ ধরনের বহু বিষয়ে তার পর তিনি নিজে গবেষণা করেছেন এবং গবেষণা পরিচালনাও করেছেন, কিন্তু যে বিষয়টিতে তাঁর এত মৌলিক অবদান ঠিক সেই বিষয়েই সম্পূর্ণ নীরব রয়ে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ। 'আন্তর্জাতিক' বিজ্ঞান গবেষণার উপযোগী যে মানসিকতা ও সংস্কৃতি তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি তিনি তাঁর ব্যক্তি-মানস ও অন্তর্লীন মতাদর্শকে। পূর্ণ চরিতার্থতা পায়নি সত্যেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা।

এই অ-চরিতার্থতার আবর্তেই বাঁক খেয়েছিল জগদীশচন্দ্রের প্রথম পর্বের গবেষণা, যাতে প্রায় সত্যেন্দ্রনাথের মতই সাফল্য অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু সে সাফল্যও চাপা দিতে পারে নি জগদীশচন্দ্রের একাকিত্বকে। যেমন পারে নি সত্যেন্দ্রনাথের বেলায়। তবে দু জনের গবেষণার ধারা বাঁক খেয়েছিল ভিন্ন পথে। সাদৃশ্য-সন্ধানী জগদীশচন্দ্র দেখলেন তড়িৎ-তরঙ্গের প্ররোচনায় জড় ও জীবের সাড়ায় মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। অনুমান ও পরীক্ষণের ভিতরকার সূক্ষ্ম ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট হতে থাকল। প্রকল্প গঠনের ক্ষেত্রে যে মতাদর্শের ভূমিকা প্রচ্ছন্ন থেকেও অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, প্রায়-প্রকাশ্যে সেই মতাদর্শেরই হাত ধরে এখন এগোতে থাকলেন তিনি।

নয়।

এ কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না যে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্বে উত্তরণও ঘটেছিল ঐ একই ভাবে দ্বিতীয় পর্বের গবেষণার অ-চরিতার্থতার কারণে।

বস্তুত, প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বে উত্তরণের কারণগুলিও এখন পর্যন্ত খুব ভাল ভাবে বোঝা গেছে বলে আমার মনে হয় না। এ নিয়ে ভবিষ্যতে হয় ত আরো বহু গবেষণা হবে, এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস বুঝতে সে গবেষণা খুবই জরুরী। জগদীশচন্দ্র বা সত্যেন্দ্রনাথদের বোঝা নিশ্চই অত সহজ নয়।

তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কাজ যখন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে লাভ করল নীরব উপেক্ষা, কখনো বা সামান্য একটু দায়সারা গোছের প্রশংসা, তখন জগদীশচন্দ্রের মত উৎসাহী মানুষও যে অন্তরে আহত বোধ করেছিলেন এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। তবে তাঁর কর্মপ্রেরণা ছিল অকল্পনীয়। এবং বস্তুত, অনেকটা যেন ঐ দ্বিতীয় পর্বের কাজকেই আরো মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে তিনি এবারে নেমে পড়লেন বহির্জগতের নানান প্ররোচনা ও উদ্দীপনায় *উদ্ভিদের সাড়া* পর্যবেক্ষণের কাজে। সুরু হল তৃতীয় পর্ব। পদার্থবিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক আর উদ্ভিদপ্রেমীর হৃদয় নিয়ে বসু উদ্বোধন করলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণার এই পর্যায়ে এসেও বসু আবার একবার প্রমাণ রাখলেন তাঁর বিচিত্র ও ব্যতিক্রমী পরীক্ষণ-ক্ষমতার, আর একই সঙ্গে, তাঁর অন্তর্ভেদী তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারও। এই তৃতীয় পর্বে বসু যে সব প্রকল্প, অনুমান ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করলেন সেগুলি তাৎপর্যে ও সম্ভাবনায় তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের কাজকেও বহুগুণ অতিক্রম করে গিয়েছিল, এ কথা বললে বোধ হয় খুব ভুল বলা হবে না।

বস্তুত, বসু বিজ্ঞানের এত বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র এত এত বিচিত্র স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এত গভীর ও মৌলিক সব পরীক্ষণ আর অনুমান হাজির করে গেছেন একের পর এক, যে সেগুলির অন্তর্বস্তু পুরোপুরি উপলব্ধি করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে থেকেছে তাঁর সময়কার ও পরবর্তী পর্যলোচকদের পক্ষে। আর, যে হেতু তিনি সমসাময়িক বিজ্ঞানী-গবেষকদের কাছ থেকে তেমন সহায়তা পান নি (বস্তুত, পাওয়ার চেষ্টাও করেন নি সে ভাবে) , সে হেতু তাঁর কাজগুলি ছিল অনেকটা আলগা ধরনের। তাঁর গবেষণা নিবন্ধগুলিকে সঠিক বলে মনে করতেন সেগুলিকেই প্রচন্ড উৎসাহে নানান 'তথ্যপ্রমাণ' সহ হাজির করেছেন বারবার, নিরপেক্ষ সমালোচক কি ধরনের যুক্তি ও প্রমাণ চাইতে পারে তার উপর গুরুত্ব দেন নি কোন দিনই। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধগুলিতে সমসাময়িক অন্যান্য গবেষকের কাজের উল্লেখ করার ব্যাপারেও অসম্ভব কার্পণ্য ছিল তাঁর, অথচ তিনি চাইতেন

তাঁর কাজ যথাযথ স্বীকৃতি পাক (প্রথম পর্বের কাজে কিন্তু এই সব প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল)। ফলত, পর্যালোচকদের চোখে জগদীশচন্দ্রের মূল্যায়নে দেখা যায় অদ্ভুত বৈপরীত্য। বস্তুত, গবেষক জগদীশচন্দ্রের মূল্যায়নে বিরূপ সমালোচনা এসে পড়া একান্ত স্বাভাবিক। তবে গবেষণার পথ-প্রদর্শক জগদীশচন্দ্রের মূল্যায়ন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। দুর্ভাগ্য এটাই যে *পথ-প্রদর্শক* জগদীশচন্দ্রের দেখান পথে হাঁটলেন না তাঁর সময়কার কেউই। এর কিছুটা দায়িত্ব তাঁর নিজের, কিছুটা দায়িত্ব তাঁর সময়ের, আর কিছু দায়িত্ব তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের।

বিজ্ঞান চায় হাতে-হাতে ফল - আজ না হয় ত কাল, নিদেন পক্ষে পরশু। এটা অবশ্য পশ্চিমী পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। পথ-প্রদর্শন তার কাছে কোন ব্যাপার নয়, যতক্ষণ না সে পথে হেঁটে ফল সংগ্রহ করে আনছে কেউ। ফল সংগৃহীত না হলে পথ-প্রদর্শকের আর মূল্য কি রইল? হ্যাঁ, এমন হতেই পারে যে, পথ-প্রদর্শক যেমনটা বলে দিয়েছেন সে পথে হাঁটতে গিয়ে দেখা গেল, অল্পবিস্তর বদলে গেছে পথের ঠিকানা। তা হোক না কেন, ফল অর্জিত হলেই হল। না হলে বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হবেন সেই সব জগদীশচন্দ্ররা।

বহু যুগ পরে সম্ভবত নতুন করে কেউ হাঁটবেন সে পথে। কিন্তু ততদিনে হয় ত জগদীশচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন সেই নতুন যুগের কোন এক গবেষণা-নিবন্ধের পাদ-টিকার সামান্য একটি ছত্রে। বা, হয়ত সেটুকুও নয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে বসুর গবেষণা বহুবিধ। তার ভিতর একটি হল উদ্ভিদের সাড়া প্রসঙ্গে অংসখ্য বিচিত্র পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নিজের তৈরী তড়িৎ-যন্ত্র ও অন্যবিধ যন্ত্রে সাহায্যে উদ্ভিদের সাড়া পরিমাপ করতেন। নৈপুণ্যে ও কৌশলে এই পরীক্ষণগুলি ছিল অতুলনীয়। ফলত, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বসু যেটুকু স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন তা প্রধানত সম্ভব হয়েছিল এগুলির জন্যই। এ ছাড়া উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তিনি আর একটি বিষয়ে পরিচিত লাভ করেছিলেন, তবে তা নেতিবাচক অর্থে - উদ্ভিদের মূল থেকে পাতা পর্যন্ত প্রাণ-রস আরোহণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। এটি বহু দিন ধরে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের কাছে হয়েছিল এক জটিল হেঁয়ালী। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ডিক্সন ও জলির প্রস্তাবিত সংসক্তি-টান তত্ত্ব বা টেনশন-কোহেশন থিওরী ক্রমশ বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। বিগত দুই দশকের ভিতর অবশ্য সংশক্তি-টান তত্ত্ব বেশ কিছুটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এম জে ক্যানী ও তাঁর সহকর্মীদের কিছু পরীক্ষণ ও প্রস্তাবের সূত্র ধরে[17]।

সংশক্তি-টান তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু বায়ুমন্ডলীয় চাপই নয়, তার সংগে জলের অণুগুলির পারস্পরিক আসক্তি-বলের ক্রিয়ায়ও মূল থেকে পাতা পর্যন্ত জল-স্তম্ভের আরোহণ সম্ভব হয়। বস্তুত, জল-স্তম্ভের ওপর দিকে 'ঋণাত্মক চাপ' উদ্ভূত হয়ে থাকে, এবং আসক্তি-বলের কারণেই স্তম্ভটি ছিন্ন হতে পারে না। বসু কিন্তু কোনদিনই এ তত্ত্ব মেনে নিতে পারেন নি খোলা মনে। তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাটি ছিল অন্য ধরনের। বসু নানান পরীক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ-কোষে *স্বয়ংক্রিয়* ও *পর্যায়ক্রমিক তড়িৎ-ক্রিয়ার* অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর অনুমানটি ছিল, এই স্বয়ংক্রিয় তড়িৎ-ক্রিয়াই পাম্পের মত কাজ করে জাইলেম নলিকায় প্রাণ-রস প্রবিষ্ট করায়। তাঁর এই অনুমান সে সময়ে প্রাণিক বলের তত্ত্ব বা ভাইটাল ফোর্স থিওরী নামে পরিচিত হয়। বস্তুত, এই নামকরণটিই ছিল এক অর্থে দুর্ভাগ্যজনক কারণ তিনি কিন্তু কোন অতিপ্রাকৃত বা প্রাণ-জঞ্জাত অজ্ঞেয় শক্তির কথা বলেন নি তাঁর প্রস্তাবে। যাই হোক, কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে সে সময় বসুর অনুমান খন্ডন করেছিলেন সে সময়কার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা।

আর, আইনষ্টাইনের বেলায় যা ঘটতে পেরেছিল, তেমনটা হল না বসুর বেলায়। কোয়ান্টাম তত্ত্বে আইনষ্টাইনের অবস্থান গ্রহনযোগ্য ছিল না, তবু তাঁর রচিত প্রশ্নকূটের সূত্র ধরেই কোয়ান্টাম তত্ত্বে এসেছিল নতুন জোয়ার। বিপরীতে, উদ্ভিদের প্রাণ-রস আরোহণের প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রাণিক বলের তত্ত্ব খারিজ হওয়ার সঙ্গে প্রায়-বাতিলের দলে পড়ে গেলেন জগদীশচন্দ্র নিজেও।

আসলে সেই সময়কার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের দল জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে গোড়া থেকেই সংশয় ও সন্দেহের চোখে দেখেছিল। আগেই বলেছি, এর পিছনে নেতিবাচক অর্থে জগদীশচন্দ্রের নিজের অবদানও কম নয়। তাই একটা অনুমান খন্ডিত হতেই তাঁকে সামগ্রিকভাবে উপেক্ষা করার একটা জমি পেয়ে গেলেন খ্যাতনামা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা। বিশেষত, প্রভাবশালী দুই-একজন-হয় ত কিছুটা সঙ্গত কারণে আর কিছুটা অসঙ্গত কারণে - জগদীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন অনেকটা যেন প্রতিরোধের পরিমন্ডল। এঁদের ভিতরই ছিলেন অগাষ্টাস ওয়ালার।

জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের কাজ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনের জন্য আরো বহু আলোচনা তোলা রয়েছে। কারণ তাঁর অন্তত দুটি অনুমান, বা বলা চলে সিদ্ধান্ত, বিস্মৃত-প্রায় জগদীশচন্দ্রকে সাম্প্রতিক কালে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে ভাস্বর মহিমায়। এদের ভিতর একটি হল উদ্ভিদ-শরীরে তড়িত-ক্রিয়ার মাধ্যমে সংকেত আদান-প্রদানের তত্ত্ব। আর অপরটির বিষয়বস্তু হল স্বয়ংক্রিয় ও পর্যায়ক্রমিক তড়িৎ-ক্রিয়ার অস্তিত্ব, এবং এর মাধ্যমে উদ্ভিদ-শরীরে *জৈব-ছন্দ* বা বায়োলজিকাল রিদ্‌ম প্রতিষ্ঠা[18]।

এর ভিতর প্রথম সিদ্ধান্তটি নিয়ে জগদীশচন্দ্র বেশ তিক্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন অগাস্টাস ওয়ালারের সঙ্গে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে নানান আবিষ্কারের অগ্রবর্তিতা বা প্রায়রিটির দাবী নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বস্তুত, জগদীশচন্দ্র নিজেই এ রকম একটি বহু-আলোচিত বিতর্কের কেন্দ্রে রয়ে গেছেন বহু দিন ধরে - বেতার সংকেতের প্রেরক ও সংগ্রাহক যন্ত্র আবিষ্কার প্রসঙ্গে। উদ্ভিদ-শরীরে তড়িৎ-ক্রিয়ার প্রসঙ্গটি কিন্তু তার তুলনায় স্বল্প তাৎপর্যের নয়। দাসগুপ্ত তাঁর পর্যালোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার নানান সূত্র ঘেঁটে এ সম্পর্কে আরো বহু কথা বলার সময় এসেছে।

'নেচার' পত্রিকায় ওয়ালার ও বসুর বিতর্কের অন্তর্বস্তু যাই হোক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হিসেবে সেই সময়ে ওয়ালারের খ্যাতি, আর তারই পাশাপাশি বসুর এক ধরনের অখ্যাতি, কিন্তু কার্যত বসুর সিদ্ধান্তের বিশাল তাৎপর্যকে চাপা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল হিমঘরে। বিগত দশ বছর বা তার কিছু বেশী সময়কালের গবেষণা কিন্তু সেই নির্বাসিত জগদীশচন্দ্রেরই পুনর্বাসন ঘটানোর উপক্রম করেছে বিজ্ঞানের যশ-কক্ষ বা 'হল-অফ-ফেম' এ।

দশ।

যশ-কক্ষে পুনর্বাসন ঘটুক চাই না ঘটুক, তার চাইতেও বড় কথা হল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা তাঁর সময়ে এবং তার পরও প্রত্যক্ষ ভাবে কোন নতুন স্রোত সৃষ্টি করতে পারে নি। জগদীশচন্দ্র রয়ে গেছেন নিঃসঙ্গ পথ-প্রদর্শক, যাঁর দেখান পথে হাঁটেন নি কোন যোগ্য আবিষ্কারক। আর, আজকের গবেষকেরা যখন উদ্ভিদ-শরীরে তড়িৎ-সংকেত প্রবাহ বা স্বয়ংক্রিয় পর্যায়ক্রমিক তড়িত-ক্রিয়া বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে মৌলিক অনুসন্ধান করে চলেছেন, আবিষ্কার করে চলেছেন নানান নতুন নতুন তথ্য, তখন হয় ত কখনো তাঁরা স্মরণ করছেন সেই বিস্মৃত-প্রায় ভারতীয় বিজ্ঞানীকে[19], কিন্তু তবু বাস্তব সত্য এটাই যে এঁরা কিন্তু জগদীশচন্দ্রের অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে *পুরাবিষ্কার* করেছেন। অর্থাৎ এঁদের অনুসন্ধান কিন্তু জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রত্যক্ষ *ফলশ্রুতি* নয়। তবে প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি না হলেও আজকের দিনের গবেষণায় জগদীশচন্দ্র ক্ষীণভাবেও অন্তত কিছুটা প্রেরণা যুগিয়েছেন, প্রমাণ সাপেক্ষে আপাতত *এমনটা* ভেবে নেওয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা।

উদ্ভিদ-শরীর যখন তার ভিতরকার ও বাইরের নানান পরিবর্তন ও প্ররোচনায় সাড়া দেয়, এবং এইভাবে তার জীবন-ক্রিয়া বজায় রাখে, তখন তার এক অংশ থেকে অপর অংশে প্রবাহিত হয় নানান সংকেত। বস্তুত, জীবন-ক্রিয়ার এক আবশ্যিক সর্ত হল এই সংকেত-প্রবাহ। অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণীর দেহে এই প্রবাহ সংঘটিত হয় স্নায়ু-তন্তুর মাধ্যমে, এবং এটি এক ধরনের তড়িৎ-ক্রিয়া। সাদৃশ্য-সন্ধানী জগদীশচন্দ্র যখন বলেছিলেন যে উদ্ভিদ-শরীরেও বার্তা আদান-প্রদান হয় তড়িৎ-ক্রিয়ার মাধ্যমে[20], তখন সে দিনের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা নাক সিঁটকে সে তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে না, বার্তা আদান-প্রদানের কাজটি ঘটে রাসায়নিক বার্তাবাহকের মাধ্যমে। এই প্রতি-তত্ত্বটির পক্ষে রায় দিয়েছিল তখনকার বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফলে তড়িৎ-সংকেতের তত্ত্বটি দীর্ঘদিন উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল, উপেক্ষিত হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রও। তড়িৎ-ক্রিয়ার কিছু সীমিত দৃষ্টান্ত নিয়ে বসু-ওয়ালার বিতর্ক এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে ওয়ালারের খ্যাতি আরো ত্বরান্বিত করেছিল জগদীশচন্দ্রের নির্বাসন-প্রক্রিয়াকে।

বস্তুত, এই নির্বাসনেরই অপর এক ফলশ্রুতি দাঁড়াল, জৈব ছন্দ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত ও অনুমান বিজ্ঞানী মহলে তেমন কোন গুরুত্বই পেল না। অথচ জৈব ছন্দ আজ জীবনবিজ্ঞানের এক বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অবশ্য এখানে একটা কথা এসে পড়ে। জগদীশচন্দ্র জৈব ছন্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রধানত তড়িৎ-ক্রিয়ার প্রসঙ্গ ধরেই। আসলে কিন্তু জৈব ছন্দ শুধু তড়িৎ-ক্রিয়া নয়, এটি বস্তুত তড়িৎ-ক্রিয়া ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সমন্বয়ে উদ্ভূত এক জটিল ও সূক্ষ্ম ঐকতান। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে জগদীশচন্দ্রই প্রথম উদ্ভিদ-শরীরে জৈব ছন্দের মূল অনেকগুলি বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তাঁর সময়ে উদ্ভিদ-পত্রের বিচলনে দিবসাবর্ত ছন্দ বা সার্কাডিয়ান রিদ্‌ম-এর বিষয়ে জানা ছিল, কিন্তু এই ছন্দ বাইরের আলো-অন্ধকারের আবর্তনের কারণে উদ্ভূত না কি উদ্ভিদের অভ্যন্তরীন ক্রিয়া, সে বিষয়ে প্রচুর সংশয় ও বিতর্ক ছিল। বসুর কাজ যে সেই বিতর্ককে প্রায় মীমাংসার কাছাকাছি এনে দিল, তা কিন্তু তাঁর প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা বশত খেয়াল করলেন না কেউই।

বসুই স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন যে উদ্ভিদের দিবসাবর্ত ছন্দ বস্তুত এক অভ্যন্তরীন ক্রিয়া, যদিও তা বাইরের দিন-রাত্রির আবর্তন চক্র দিয়েও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। অভ্যন্তরীন ক্রিয়ার ওপর বাইরের এই নিয়ন্ত্রণ, এটা তিনি আরো ভালভাবে দেখিয়েছিলেন তুলনায় এক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পর্যায়কালের অপর একটি ছন্দ ধরে। এটির পর্যায়কাল ছিল মাত্র এক মিনিট মত।

[3] অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস : রামানুজন - সত্যেন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, কলকাতা, জানু-ফেব্রু, 1984.

[4] Pat Duffy Hutcheon, Popper and Kuhn on the Evolution of Science, Book Review, vol. 4, No. 1/2, p.28-37,1995

(http://humanists.net/pdhutcheon, Papers and Presentations/Popper and Kuhn on the Evolution of Science.htm)

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/michael_Polanyi. এই আন্তর্জালিক-গ্রন্থিতে পোলানী এবং তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে, এবং পাওয়া যাবে উপযুক্ত সূত্র-পঞ্জী।

[7] Subrata Dasgupta, Jagadis Chandra Bose and the Indian Response to western Science, Permanent Black, Ranikhet, (print) 2009 (published, 1999)

এই গবেষণা-সমৃদ্ধ বইটিকে আমি আকর-গ্রন্থ রূপে ব্যবহার করেছি - নিবন্ধে বার বার এর উল্লেখ করি নি বাহুল্য-বোধে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলির সূত্র ধরে যদি কোন ভ্রান্তি থেকেই যায়, তার দায় সম্পূর্ণ আমার।

[8] Ashis Nandy, Alternative Sciences: Creativity and Authenticity in Two Indian Scientists, Oxford University Press, Delhi, (2nd ed.) 1995.

[9] Keith J. Holyoak and Paul Thagard: Mental Leaps: Analogy in Creative Thought, MIT Press, Massachusetts, 1996.

[10] Lewis Samuel Feuer, Einstein and the generations of science, Transaction Publishers, new Jersey, 1989.

[11] A. Einstein, Ideas and Opinions, Bonanza Books, New York, 1954.

[12] Robert C. Hiborn, Sea-gulls, butterflies, and grasshoppers:a brief history of the butterfly effect in nonlinear dynamics, American Journal of Physics, vol. 72, p 425-427, 2004.

[13] অত্রি মুখোপাধ্যায়, কেন জগদীশচন্দ্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জগদীশচন্দ্র বসু বিশেষ সংখ্যা, (বাং) ১৪১৫। জগদীশচন্দ্রের পদার্থ-বিজ্ঞানের কাজের একটি পর্যালোচনা রয়েছে এই নিবন্ধে।

[14] অভিজিৎ লাহিড়ী, (i) সূত্র নং [3] , (ii) মেঘনাদ সাহা : ভারতীয় ট্রাজেডির প্রতিচ্ছবি, প্রস্তুতিপর্ব, কলকাতা, 1978 (সংযোজন সহ অন্যত্র পুনর্মুদ্রণের অপেক্ষায়, 2009)।

[15] অভিজিৎ লাহিড়ী, স্থূল দর্শনে সূক্ষ্ম জগৎ, আলোচনাচক্র, কলকাতা, আগষ্ট, 2009.

[16] সূত্র নং [3] দ্রষ্টব্য।

[17] দ্রষ্টব্য : V. A. Shepherd, From semi-conductors to the rhythms of sensitive plants: the research of J. C. Bose, Cell. Mol. Biol. Vol. 51, p 607-619, 2005

এই লেখকের একটি পর্যালোচনা পাওয়া যাবে নিচের আন্তর্জালিক-গ্রন্থিতে :

http://www.ias.ac.in/currsci/jul10/articles33.htm

[18] M.K. Chandrashekaran and R. Subbaraj, J. C. Bose's Views on Biological Rhythms, Indian Journal of History of Science, vol. 31, p 375-382, 1996.

[19] Eric D. Brenner, Rainer Stahlberg, Stefano Manusco, Jorge Vivanco, Frantisek Baluska, and Elizabeth Van Volkenburgh, Plant neurobiology: an intergrated view of plant signaling, Trends in Plant science, vol 11, p 413 - 419, 2006.

[20] ঐ।

[21] সূত্র নং [17] ও [18] দ্রষ্টব্য।

[22] সূত্র নং [17] দ্রষ্টব্য।

[23] দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দ্রষ্টব্য : E. Bunning, Die Physiologische Uhr, Springer Verlag, Berlin, N. Y., 1958.

[24] বসুর কাজে সমগ্রবাদের ছাপ লক্ষ করে তারিফ করেছিলেন B. E. Livingston তাঁর একটি পর্যালোচনায় (1914); সূত্র নং [7] এ উদ্ধৃত।

[25] সূত্র নং [18] দ্রষ্টব্য।

[26] Pratik Chakrabarti, Western science in modern India: Metropolitan Methods, Colonial practices, Permanent Black, Delhi, 2004.

অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ 'সুনির্মল' বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সাধক

আশীষ লাহিড়ী

['মুক্তমন ও সাহসী' অক্ষয়কুমার দত্ত যে আজও প্রাসঙ্গিক এবং একজন পুরোধা পথিকৃত, বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকদের তা যথার্থভাবেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শ্রী লাহিড়ী। - সঃ মঃ]

আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পত্তনপর্ব নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৮৮৬ সালের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮২০-৬০ এই পর্বটিকে তিনি 'পরিবর্তন সময়' (ট্রান্‌জিশন পীরিয়ড) বলে চিহ্নিত করেছিলেন। শাস্ত্রী মশাইয়ের কথায়, 'পরিবর্তন সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময় বড়ো বড়ো চিন্তাশীলগণের সময়। আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফলে। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্তন সাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্তন কি আর-কখনো হইয়াছিল .....? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর আর-কখনো কোনো দেশে কোনো কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল?' ১৮১৫ থেকে ১৮৮৬-র মধ্যে, বিশেষ করে ১৮৬০ -এর পর থেকে 'প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙালির সম্মুখে আপনাদের গুপ্ত ভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। ..... আমরা এক-এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি।' এই অবিশ্বাস্য চিন্তা-সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিহ্বল বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী 'এমন সুবিধার কী কার্য্য করিতেছেন' তা বিচার করে দেখবার আহ্বান জানান তিনি: তাঁহারা নূতন সাহিত্য গঠনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোত কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পরে।'[১]

শাস্ত্রীমশায় পরিবর্তনের কালকে অনুবাদ, শিক্ষা, জিনিয়স, চিন্তাশীলতার কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত-কে (১৮২০-১৮৮৬) জিনিয়াস বলব না, কিন্তু ঐটি বাদে তাঁর মধ্যে এর প্রায় সবকটি লক্ষণই দেখতে পাই। তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনাসম্ভারের অনেকটাই হল অনুবাদ — সাক্ষাৎ অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ। *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা*, এমনকি *চারুপাঠ*-এরও অনেকটাই কোনো না কোনো অর্থে অনুবাদ। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একেকটি সময় আসে যখন অনুবাদের গুরুত্ব মৌলিক রচনার সঙ্গেই তুলনীয় হয়ে ওঠে। শাস্ত্রীমশাই সেই অর্থেই 'পরিবর্তনসময়ের' সঙ্গী হিসেবে 'অনুবাদের সময়' -এর উল্লেখ করেছেন। সভ্যতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর্বগুলিতে অনুবাদের মূল্য সমধিক। গ্রীক থেকে আরবি, পরে আরবি থেকে লাতিনে যেসব বিজ্ঞানরচনার অনুবাদ হয়েছিল, সেগুলির ভূমিকা মূল রচনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সেসব অনুবাদ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা মূল রচয়িতার তুলনায় কিছু কম স্মরণীয় নন।

অক্ষয়কুমার দত্তর *পদার্থ বিদ্যা* (১৮৫৬) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে:

(১) কোন মণ্ডলাকার বস্তুর পৃষ্ঠস্থিত সমুদায় দ্রব্য সেই বস্তুর কেন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ মধ্য দিকে সমান আকৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত এই আকর্ষণকে মাধ্যাকার্ষণ কহে। (পৃ ২৫)

(২) যে গুণ থাকাতে, এক দ্রব্য দূর হইতে অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহার নাম মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষের ফল, মেঘের জল, ছাদের ইষ্টক ইত্যাদি পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে পাতিত হয়। .....

যদি পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে বাষ্প ও ধূম ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয় কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য বটে। আকর্ষণই উহার কারণ। যেমন, সোলা ও তৈল জল অপেক্ষা লঘু, এ নিমিত্ত জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠে, সেরূপ বাষ্প ও ধূম পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু, এ মিমিত্ত বায়ুর মধ্য দিয়া উত্থিত হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বাষ্প ও ধূমকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বায়ু বাষ্পাদি অপেক্ষা ভারী, এ প্রযুক্ত আপনি অধঃপতিত হইয়া বাষ্পাদিকে উৎক্ষিপ্ত করে। ইহাতেই বাষ্প ও ধূম ঊর্ধ্বগামী হয়, এবং উঠিতে উঠিতে, যে স্থানে বায়ুর ভার ঐ বাষ্প ও ধূমের সমান, সেই স্থানে স্থির হইয়া থাকে। (পৃ২১)

(৩) আকর্ষণ-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ক্রম আর এক প্রকার। এক ক্রোশ দূরে তাহার চারিভাগের এক ভাগ, তিন ক্রোশ দূরে তাহার নয় ভাগের এক ভাগ। চারি ক্রোশ দূরে ষোল ভাগের এক ভাগ। ইহার সঙ্কেত এই, দূরের সঙ্খ্যা যত হইবে, তাহার গুণ করিলে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সে স্থানে আকর্ষণের বল তত ভাগের এক ভাগ হইবে।

দূর	১	২	৩	৪	৫	৬ ইত্যাদি
আকর্ষণ	১	১/৪	১/৯	১/১৬	১/২৫	১/৩৬ ইত্যাদি

(পৃ ২৪)

(৫) জড় বস্তু উচ্চ হইতে পড়িবার সময়ে এক সেকন্ড কালে, অর্থাৎ ২।। অনুপলে ১৬ ফুট পড়ে। পৃথিবী যদি একবার মাত্র ঐ বস্তু আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিত তবে তাহা এই নিয়মানুসারেই অর্থাৎ প্রতি সেকন্ডে ১৬ ফুট করিয়া নিয়ত পতিত হইত। কিন্তু পৃথিবী তাহাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে। এ কারণ ঐ ১৬ ফুট পড়িতে পড়িতে তাহার বেগ এত বৃদ্ধি হইয়া আইসে যে দ্বিতীয় সেকন্ডে ৪৮ ফুট পতিত হয়। এই রূপ তৃতীয় সেকন্ডে ৮০ ফুট, চতুর্থ সেকন্ডে ১১২ ফুট, পঞ্চম সেকন্ডে ১৪৪ ফুট ইত্যাদি। এই ১৬, ৪৮, ৮০, ১১২ ও ১৪৪ একত্র যোগ করিলে ৪০০ ফুট হয়। অতএব, যদি ঘড়ি ধরিয়া দেখা যায়, এক খান প্রস্তর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে সেকন্ড প্রমাণ কালে ভূতলে পতিত হইল, তবে অনায়াসেই বলা যায়, ঐ পর্ব্বত ৪০০ ফুট উচ্চ। ইহা গণনা করিবার একটি সুন্দর সঙ্কেতও আছে, তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। পড়িতে যত সেকন্ড লাগে, তাহাকে তত গুণ করিয়া পুনরায় ১৬দিয়া পূরণ করিতে হয়। ইহাতে যত অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায় তত ফুট উচ্চ হইতে পড়িল বলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোন শূন্য কূপের তলায় লোষ্ট্র পতিত হইতে দুই সেকন্ড লাগে, তবে সে কূপ ৬৪ ফুট গভীর। কারণ দুইকে দুই গুণ করিলে ৪ হয়, সে ৪-কে পুনর্ব্বার ১৬ দিয়া পূরণ করিলে ৬৪ হয়। (পৃ ১০২-০৩)

ইংরেজী থেকে অনূদিত এই বাংলাকে বাংলা বলে চিনে নিতে আজকের দিনেও কোনো অসুবিধে নেই। গদ্যের চলনটা যে পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব-ব্যাখ্যার উপযোগী, তাও স্বীকার্য। আরো লক্ষণীয়, পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলিকে বোঝাবার জন্য তিনি বাঙালির পরিচিত পরিবেশ থেকেই উদাহরণ দিয়েছেন। কলুর ঘানিগাছে বাইরের দিকে মাথা করে শুয়ে ঘুরতে থাকলে রক্ত ক্রমে মাথার দিকে কেন্দ্রীভূত হতে থাকায় মৃত্য পর্যন্ত হতে পারে — সেন্ট্রিফিউগাল (তিনি বাংলা করেছিলেন 'কেন্দ্রাপসরণী') বলে এই উদারহণ চমকপ্রদ শুধু নয়, তখনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ। উচ্চ তাপমাত্রায় ধাতুর গলন, এবং মাধ্যাকর্ষণ-বলের টানে নিচে পড়বার সময় সেই গলিত ধাতু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার ফলে কী ঘটে তা বোঝাবার জন্য সীসের গুলি তৈরী করবার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন তিনি: তদ্ব্যবসায়ীরা ভূমি হইতে প্রায় ১৩০ হস্ত উর্দ্ধে একখান চালনী রাখে, এবং সীসক দ্রব করিয়া সেই চালনীর উপর ঢালিয়া দেয়। সীসের ধারা চালনী হইতে নির্গত হইবা মাত্রে অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া গোল গোল হয়। সেই সকল গোলাকার সীসকবিন্দু ভূমিতলে না পড়িতে পড়িতে শীতল হইয়া কঠিন হয়। (পৃষ্ঠা ৩২)

এর আগে কোনোদিন বাঙালি এসব বিষয় নিয়ে এমন ভাষায় লেখালেখি করেনি। আক্ষরিক অর্থেই অভূতপূর্ব একটি বিষয়কে বাংলা ভাষায় বাঙালি পাঠকদের কাছে বোধ্যরূপে মেলে ধরা মানে একটি মৌলিক বিষয়েরই প্রবর্তন করা। অক্ষয় দত্ত সেই প্রবর্তকের কাজটিই করেছিলেন।

তার অর্থ এ নয় যে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি রাতারাতি বুঝে ফেলেছিলনে বা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। বরং ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চার একেবারে টাটকা ফসলগুলির ভালোমন্দ বিচারে তিনি কোথাও কোথাও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। জর্জ কুম্ব-এর চিন্তাধারাই তার উদারহণ। কুম্ব বিজ্ঞানের ভিত্তিতে একটি সেকিউলার নৈতিক ও সামাজিক সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে-বিজ্ঞানকে তিনি তাঁর এই পরিকল্পনার দুর্ভেদ্য বনেদ বলে ধরে নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, সেই ফ্রেনোলজি পরে একটি মেকি-বিজ্ঞান বলে প্রমাণিত, নিন্দিত ও বর্জিত হয়। অথচ কুম্ব-এর প্রভাবে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু মানুষের মতো (আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস-এর প্রসিদ্ধ বিবর্তন-বিজ্ঞানী তাঁদের অন্যতম) অক্ষয়কুমারও সেই ভুল ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তবে বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্যই এই যে তা নিরন্তর ভুল শোধরাতে শোধরাতে এগোয়। সেই জন্যেই 'ফল্‌সিফায়েবিলিটি,' অর্থাৎ খণ্ডনযোগ্যতা বিজ্ঞানের একটিকাম্য বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যেই বিজ্ঞান চিরবিকাশমান একটি ক্ষেত্র। সেই জন্যেই অবশেষে ফ্রেনোলজি একটি ভ্রান্ত শাস্ত্র বলে নিন্দিত ও বর্জিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার বিকাশেও এই ব্যাপারটি লক্ষণীয়। ১৮৬০-এর থেকে তাঁর চিন্তাভাবনা বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে কেবলই বিকশিত হয়ে চলে। বিশেষত ডারউইন ও হাক্সলির রচনার সঙ্গে পরিচয় গভীর হওয়ার পর থেকে তাঁর লেখায় কুম্ব-এর উল্লেখ আর দেখতে পাওয়া যায় না।

অক্ষয়কুমারের সবচেয়ে মৌলিক রচনা *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*-এর (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) দীর্ঘ দুই উপক্রমণিকায় বেকন, কোঁত, হম্বোল্‌ট, হিউম, ড্যাল্টন, ডারউইন, হাক্সলি প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের নাম ও বক্তব্য বহুবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হলেও একবারও কুম্ব-এর নাম উল্লেখিত হয় নি। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*-এর সেই দীর্ঘ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পরিক্রমার অন্তে তিনি জানান: ষড়্‌দর্শনের অনেকটাই অনীশ্বরবাদী অথবা সংশয়ী মতবাদে পূর্ণ। অন্যান্য গৌণ দর্শনও 'এক একরূপ নাস্তিকতাবাদ' ছাড়া আর কিছুই নয়। আর চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রধান অ-বৈদিক দর্শনগুলির ঈশ্বর-অস্বীকৃতি তো সুপ্রসিদ্ধ। অক্ষয়কুমারে প্রশ্ন: তা যদি হয়, তাহলে কেন আমরা বলব যে ভারতের সব কিছুই ঈশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'খাঁটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ নিয়েই তিনি দেখেছেন যাবতীয় আস্তিক দর্শনকে আর সেই সঙ্গে বেদ-বাদী ও বেদ-বাহ্য ... উপাসক সম্প্রদায়কে। তাঁর আগেও এই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এইচ এইচ উইলসন, পরেও করেছেন আরও অনেক গবেষক (এঁদের মধ্যে আরও একজন ধ্রুববাদীর নামও স্মরণ করা উচিত: যোগেন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য)। কিন্তু অক্ষয়কুমারের আগে বা পরে কেউই আস্তিক দর্শন ও ধর্মমতকে 'মানসিক রোগ' বলে ঘোষণা করেননি (যদিও তেমনই মনে করে থাকতে পারেন)। তাঁদের মনোভাব ছিল একান্তই অ্যাকাডেমিক; রোগের মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না।'[২] যে-উপলক্ষে রামকৃষ্ণবাবু এই কথা বলেছেন সেটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

কী ভয়ানক শারীরিক অপটুতার মধ্যে ভা উ স দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে হয়েছে, তা বর্ণনা করে উক্ত উপক্রমণিকায় অক্ষয় দত্ত বলেছেন —সন্ন্যাসী, সৎনামী, বীজমার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী প্রভৃতির গূঢ় মন্ত্র ও গুহ্য ব্যাপার যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কি বলিব? এরূপ কার্য্য সাধন করিতে হইলে সকলকেই বিশেষ যত্ন, সমধিক পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হয়! আমাকে তদতিরিক্ত এই জীবন্মৃত শরীরেরও স্বাস্থ্যক্ষয় করিয়া আত্ম-সন্নিধানে অপরাধী হইতে হইয়াছে।

অর্থাৎ তিনি জেনেশুনেই বিষ পান করেছিলেন। জীর্ণ, অশক্ত শরীরের পক্ষে যা-যা বিষবৎ, তাই করেছিলেন, করে নিজের কাছেই অপরাধী হয়েছিলেন। কীসের তাড়নায় এত বড়ো ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি? —

এই সমস্ত অঙ্গীকার করিয়াও, যদি জনসমাজ-বিশেষের কোন অন্তর্ভূত মানসিক রোগের বিষয় কিছু জানিতে পারিয়া থাকি, তবে সেটি আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

তার মানে এই ধরণের জনসমাজ-বিশেষের মধ্যে প্রচলিত বিচিত্র— বহু ক্ষেত্রে বিকৃত — ধর্মাচরণকে তিনি মানসিক রোগ বলেই মনে করতেন এবং সেই রোগ-নির্ণয়ের কাজকে এক জরুরী কাজ বলে মনে করতেন। কেননা, রোগ নির্ণয় না হলে রোগের নিরাময় সুদূরপরাহত। আমাদের দেশে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মাচরণকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃৎ।

ব্রিটিশ শাসন ও অক্ষয়কুমার

মননগত স্তরে অক্ষয়কুমার দত্ত বেকন, নিউটন, লক, ফরাসি অঁসিক্লোপেদি গোষ্ঠী, হিউম, কোঁত, হুম্বোল্ট, জন স্টুয়ার্ট মিল, ডারউইন, হাক্সলি, (কিন্তু, লক্ষণীয়, হার্বার্ট স্পেন্সার নয়) প্রমুখের সহযাত্রী ছিলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে পরম আদরে গ্রহণ করেও 'সামাজিক ডারউইনবাদের' ফাঁদকে সযত্নে এড়িয়ে চলার মতো তাত্ত্বিক বিচক্ষণতা তাঁর ছিল — যা, অন্তত এদেশে, তখন খুব সুলভ ছিল না। ইউরোপের (শুধু ব্রিটিশ নয়) মুক্তিচিন্তার ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। একথাও ঠিক যে অধঃপতিত মুঘল রাজত্বের কুশাসনের হাত থেকে 'মুক্ত' করার জন্য আর পাঁচজন অ-মুসলামান ভারতীয়ের মতো তিনিও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে শ্রেণীগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্বার্থ কোনোভাবেই জড়িত ছিল না। জীবননির্বাহের জন্য তিনি জমির আয় কিংবা ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রসাদের ওপর কোনোভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন না। তাই ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালি কৃষক ও শ্রমজীবিদের কী ভয়ানক দুর্দশা হয়েছে, তা নিয়ে তিনি বরাবর তীক্ষ্ণভাবে সচতেন ও সরব ছিলেন। জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ প্রশাসনের মাখামাখি নিয়ে, ইংরেজ শাসনে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি, বাঙালিদের (বিশেষ করে 'ইতর শ্রেণী'র বাঙালিদের) ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি বিষয়ে অকুতোভয়ে লিখেছেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আগেই তিনি বাংলার কৃষকদের ওপর নীলকরদের বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলন্ডের বিজয়কামনায় হরিশচন্দ্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চাইলে, সে-প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন অক্ষয়কুমার। তিনি মনে করতেন, নিকট-অতীতের মুঘল কুশাসনের তুলনায় ইংরেজ শাসন অনেক সুশৃঙ্খল হতে পারে, কিন্তু ভারতের সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ সে শাসনে অন্ধকার। তার প্রধান কারণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষীদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার, এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের অবিচার এক অমানুষিক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে দেশের শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধির দরুন যে উন্নতি হয়েছে তা বঙ্গভূমিকে **'কতিপয় বাহ্যশোভায় শোভিত'**

করলেও 'আর দিকে সহস্রপ্রকার দুর্গতির চিহ্ন' প্রকট হয়ে উঠেছে। 'বাণিজ্যবৃদ্ধির দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ বেতনভূক পরিশ্রমী লোকের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই।'। দেশের উন্নতি বলতে তিনি বুঝতেন গরিব চাষীদের ও 'বেতনভূক পরিশ্রমী লোকের' উন্নতি। 'কতিপয় ব্যক্তি .... উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া, উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এবং সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী' হয়েছে দেখে তিনি সেটাকে দেশের উন্নতি বলে ভুল করেন নি। দেশের সম্পদ বন্টনের এই ভয়াবহ অসাম্য যে ইংরেজ রাজত্বের প্রত্যক্ষ অবদান, সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধাহীন বক্তব্য:

ইংরেজরা অধর্ম্ম-সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্ম-সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন।[৪]

১৮৫১ সালে তিনি এমন মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি যে রাজপরুষেরা যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। অন্য দেশে এ-প্রকার ঘটনা ঘটিলে একটা খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেমন দুর্দান্ত, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমনি মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন।[৫]

এর বছর ছয়েক পরে দেশে সত্যিই তো খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার কি তার কিছু পূর্বাভাস পেয়েছিলেন? একথা অবশ্য সত্যি যে সব কিছু সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের কোনো আশু বিকল্প তিনি দেখতে পাননি, কাজেই রাজনৈতিক হতাশা গ্রাস করেছিল তাঁকে। রাজনারায়ণ বসুকে এক মর্মস্পর্শী পত্রে লিখেছিলেন, "ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।"

রামমোহন রায় কে যিনি গুরু মানতেন, রামমোহনের বিজ্ঞানচেতনার 'দুন্দুভি'বাদনকে যিনি বারংবার উচ্ছ্বসিত প্রণতি জানিয়েছেন, সেই তিনিই গুরুর মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ইংরেজ শাসনকে ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে অমঙ্গলজনক বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। চিন্তার এই স্বাবলম্বন যেকোনো যুগেই দুর্লভ।

বিংশ শতাব্দ পার করে দেওয়ার পর, অনেক অবিশ্বাস্য উত্থানপতন দেখার পর, 'মুক্তিদাতা' বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়েই অনেক সন্দেহ ও সংশয়ে দংশিত হবার পর, আজ মনে হয়, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো স্বাবলম্বী মানুষকে আমাদের অন্তরের সঙ্গী করে নেওয়ার প্রয়োজন খুব বেশি। এ জন্য নয় যে তিনি সবকিছু ঠিকঠাক বুঝেছিলেন বা তাঁর দিগ্‌দর্শন বিনা সমালোচনায় গ্রহণের যোগ্য। কিন্তু যে-সাহসের সঙ্গে তিনি মূলস্রোতের বিরোধিতা করে আপন স্বাতন্ত্র্যে অবিচল ছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত যেভাবে অনুসন্ধানবৃত্তিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতাকে যেভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, সেই মুক্তমন সাহসিকতার জন্যই আজ জন্মের একশো নব্বই বছর পর, তিনি আমাদের কাছে নতুন করে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। আপ্তবাক্যের পায়ে চিন্তাহীন আত্মসর্মপণ নয় — 'সুনির্ম্মল' বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-শাসিত বাস্তবমুখী জীবনচর্যায় উদ্বুদ্ধ করাই অক্ষয়কুমার দত্তের সবচেয়ে বড়ো অবদান।[৬]

তথ্য সূত্র ঃ

১। *সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০।*

২। *রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কামারের এক ঘা, পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬৮।*

৩। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২: ৩১৬*

৪। *অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্ম্মনীতি, ১৮৫৬।*

৫। *মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪৫-এ উদ্ধৃত।*

৬। *এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আশীষ লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার দত্ত: আঁধার রাতে একলা পথিক, দে'জ পালিশিং, কলকাতা, ২০০৭।*

আন্দামানের 'হিংস্র' জারোয়া - সরকারী ভূমিকা ও সংবাদপত্রের নীরবতা

সুভাষ গাঙ্গুলী

[আমাদের 'সভ্য' সমাজের সংস্পর্শে এসে 'অসভ্য' সমাজ কেমন করে বিলুপ্তির পথে যেতে পারে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ও সংবাদমাধ্যমের কি ভূমিকা দেখা যাচ্ছে নীচের রচনায় (যার মূল অংশ সংবাদ মাধ্যমে পাঠান একটি অপ্রকাশিত চিঠি) আমাদের দেশের পটভূমিতে তা খানিকটা হলেও হয় তো দেখা যাবে। বিষয়টা বৃহৎ সংবাদ মাধ্যমের বাইরেও অর্থাৎ আমাদের Little Magazine-এর জগতেও এখনও খুব আলোচিত নয়। বিষয়টিতে আমাদের নজর পড়লে ভালো হয় এরকম একটা বিশ্বাস থেকেই অপরিবর্তিত ভাবে এই রচনা উপস্থিত করা হ'ল।

আর কারা 'সভ্য' ও কারা 'অসভ্য' সে যে আমরা 'সভ্যরা' একতরফাভাবে গায়ের অর্থাৎ অস্ত্রের জোরে ঠিক করেছি এ'ত সুবিদিত। তার যাথার্থ্য নিয়ে বহু প্রশ্ন দুনিয়া জুড়েই উঠছে। - সঃ মঃ]

পটভূমি

মানচিত্রে খানিকটা লম্বাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের যে দ্বীপমালার নাম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, তার অবস্থান ভারতের মূল ভূখন্ডের পূর্ব দিকে সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) উপকূল থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পূর্বে। উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বা ও প্রসারিত এবং তুলনায় পূর্ব-পশ্চিম বরাবর প্রস্থে সংকুচিত। আন্দামানের মোট ভূমি আয়তন 648 বর্গ কি. মি.। অরণ্য আচ্ছাদিত ও পাহাড়ী এই দ্বীপমালার ক্রান্তীয় আবহাওয়া একই সাথে উষ্ণ ও আর্দ্র; শীতকাল বলে এখানে কিছু নেই। এই দ্বীপগোষ্ঠীর উত্তর দিকের বৃহত্তর অংশটির নামকরণ করা হয়েছে 'বড় আন্দামান' (Great Andamans)। তার থেকে পার্থক্য করার জন্য মোট ভূমির অনেক ক্ষুদ্রতর অংশটিকে 'ছোট আন্দামান' (Little Andamans) নামে চিহ্নিত করা হয়। এই 'ছোট আন্দামান' রয়েছে 'বড় আন্দামান' থেকে সমুদ্র বরাবর আরও নীচের দিকে দক্ষিণে ১০০ কি. মি. এর উপর দূরে। ভারতের মূল ভূখন্ড আন্দামানের পশ্চিমে। দূরত্বের দিক থেকে সমুদ্রে অন্যান্য দিকে, অর্থাৎ আন্দামানের পূর্বে উত্তরে, মূল ভূখন্ডের অর্ন্তভুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি (বর্মা, থাইল্যান্ড মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি) ভারতের তুলনায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অনেক কাছে - কয়েকশ কিলোমিটারের মধ্যে।

অরণ্যের সবুজ চাঁদোয়ায় ঢাকা থাকায় অনেকের কাছেই পান্না 'দ্বীপপুঞ্জ' (Emerald Islands) বা 'সবুজ দ্বীপ' নামে অধুনা সুপরিচিত সমুদ্র পরিবেষ্টিত আন্দামানের এই দ্বীপগুলি তিন দিক দিয়ে ঘেরা মহাদেশীয় মূল ভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে- হয়তো দশ হাজার বছর বা তারও বেশী (এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য নেই) - কয়লার মত কালো গাত্রবর্ণ ও কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট* বহু জনজাতিগোষ্ঠির (tribes) একচেটিয়া ও আজন্ম বাসভূমি হয়ে ছিল। তাঁদের বসবাসের কালসীমার মতনই এটাও সমানভাবে অস্পষ্ট যে এঁরা এসে পড়ে বসবাস শুরু করলেন কী ভাবে এবং/অথবা কোথা থেকে। কারণ যে এশীয় ভুখন্ড দিয়ে এই দ্বীপগুলি ঘেরা সেখানে সবদিক থেকে এঁদের মত শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোন জনজাতিগোষ্ঠির অস্তিত্বের কথা এখনও জানা যায় নি।

এঁদের জীবন যাপনের সবচেয়ে নজরে পড়ার মত দিক (বিশেষজ্ঞ ও অ-বিশেষজ্ঞ আমাদের মত সাধারণ মানুষ উভয়ের কাছেই) হল এঁদের সমাজের আদল। সেটা ছিল সামাজিক

---

* *যার সাথে মূল আফ্রিকাবাসীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকার কারণে এদের কায় বিষয়ক বা শরীরিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক নৃত্যাত্ত্বিক (Physical Anthropology) পরিভাষায় 'নিগ্রো' জনধারাভুক্ত (of Negroid Stock) বলে চিহ্নিত করা হত। বহিরাবয়ব-ভিত্তিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক জনধারাগত (racial) এই ধরনের নির্দিষ্ট বিভাজন বা নামাকরণের গ্রহণযোগ্যতা/অর্থময়তা সম্পর্কে এখন নৃতাত্বিকদের মধ্যেই গভীর অনৈক্য/মতাপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। শ্বেতকায়দের দুনিয়াজোড়া ঔপনিবেশিক আধিপত্যের আমলে নিকৃষ্টতর জনধারাগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যেও এই নামাকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব নানা দিক থেকে আপত্তিকর হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাইরের চেহারার দিক থেকে (অর্থাৎ মানসিক/আত্মিক এ জাতীয় অন্য কোন দিক থেকে নয়) চেনা/চেনান'র জন্য এখনও অনেকসময় ঐ শব্দ আলগা অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন নিচে উপস্থাপিত চিঠিতে করা হয়েছে।*

বিবর্ত্তনের ভাষায়, যাকে বলে 'শিকারী ও সংগ্রাহকের' সমাজ (Hunter-Gatherers' Society)। তার অর্থ এঁরা স্থায়ী বাসস্থানের ধার ধারতেন না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরম্পরাগতভাবে চলে আসা আঞ্চলিক সীমারেখা ভাগাভাগির ভিত্তিতে নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে খুশীমত ঘোরাফেরা করতেন। যেখানে যখন আছেন সাময়িক বাসস্থান তৈরী করে নিতেন। কোনধরনের কৃষিকাজ বা পশুপালন জানতেন না। অরণ্যের গাছ গাছলি, সমুদ্র, খাঁড়ি, নদী, খাল এসব জায়গা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে, তুলে নিয়ে, শিকার করে বা ধরে ফেলে খাদ্য জড়ো করতেন এবং কেবলমাত্র তারই উপর স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করে থাকতেন। টাকা-পয়সা বলে কিছু জানা ছিল না, কাজেই ছিল না বাজার বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বালাইও। এঁদের নিজ নিজ ভাষায় নিশ্চয় এসব কথার সমার্থক কোন শব্দ ছিল না, যদিও এ সম্পর্কে সরাসরি কিছু আমি এখনও পর্যন্ত জানিনা। এবং অবশ্যই এঁরা ছিলেন 'নগ্ন'। আন্দামানে গেলেই যে কেউ বুঝবেন যে এই দ্বীপমালার জলবায়ু বা আবহাওয়াতে সবচেয়ে আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত পোষাক হল ইংরেজীতে যাকে বলে 'জন্ম মূহূর্ত্তের পোষাক' (birth day suit) অর্থাৎ কোন পোষাক নয়।

ঔপনিবেশিক ভারতের কালে ইংরেজদের পদার্পণের আগে পর্যন্ত সংক্ষেপে এই ছিল অবস্থা। এই পদার্পণ প্রথম ঘটে সাময়িক ভাবে ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৬ এবং পরে স্থায়ীভাবে ১৮৫৮ সাল থেকে। এবং তখন থেকেই শুরু হয় 'সভ্যতার' ছেদহীন আক্রমণে আন্দামানের 'অসভ্য' আদি জনগোষ্ঠীগুলির শারিরীক, সামাজিক ও আত্মিক ধ্বংসের অন্ধকারময় যুগ। কিন্তু আজও, অর্থাৎ স্বাধীন ভারতেও যে তা অন্য চেহারায় চলছে তা ঘটনাচক্রে আন্দামানে যাওয়ার আগে আমার জানা ছিল না। আমার স্ত্রী'র (ভারতী) কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীতে এক বছরের জন্য (2002-03) সাময়িক বদলির সুযোগে দুই খেপে আমি আন্দামানে গিয়ে এবং কয়েকমাস থেকে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে ভারতের মূল ভূমি থেকে আন্দামানের অন্যতম (কিছুদিন আগে পর্যন্ত একমাত্র, এখন যোগ হয়েছে বিশাখাপত্তনম ও চেন্নাই) প্রবেশদ্বার (Gateway) কলকাতা হওয়া সত্ত্বেও, স্বাধীন ভারতের সরকার এখনও পর্যন্ত টিকে থাকা সেখানকার এক আদি জনজাতির বাধা কি নিষ্ঠুরভাবে দমন করে ঝাড়ে-বংশে তাদের সামূহিক বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করছে (অবশিষ্ট জারোয়ারা সংখ্যায় মাত্র ২০০-২৫০) তা কলকাতায় থেকেও জানতে পারি নি। কারণ কলকাতার গণমাধ্যম গুলি এই খবর সম্পূর্ণ জেনেশুনে সাধারণের কাছে চেপে গেছে অর্থাৎ পৌছাতে দেয় নি।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরে সুপরিচিত ও নির্ভীক সাংবাদিকতার সোচ্চার গর্বে গর্বিত এক ইংরেজী সংবাদপত্রে (The Statesman) এক বিদেশি প্রতিবেদকের প্রতিবেদনে আংশিক ভাবে এই সংক্রান্ত উল্লেখ দেখে এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদকের কিছু ভুল ধারণা সংশোধনকল্পে ঐ সংবাদপত্রে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম এবং যা তাঁরা ছাপেন নি, সেটি এবং তার বঙ্গানুবাদ দিয়ে দেওয়া হল। চিঠিটি থেকে পাঠকরা ইংরেজরা চলে যাবার পরের ছবিটা সম্পর্কে হয়তো সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হলেও একটা মোটামুটি ধারণা (সরকার ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সহ) পেতে পারেন এই আশাতেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের এই রূপ অবতারণা। এটুকু যোগ করা দরকার যে নীচের চিঠিতে বর্ণিত জারোয়া সংক্রান্ত পরিস্থিতির চিঠি লেখার পরের ৬ বছরে আরও অবনতি হয়েছে, যদিও সংবাদ পত্রের পাতায় তা পাওয়া যাবে না। ঐ প্রতিবেদকের ইংরেজী প্রতিবেদনের যে অংশগুলির উল্লেখ চিঠির মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রয়েছে সেই অংশগুলি বঙ্গানুবাদসহ চিঠি শুরুর আগে দিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চিঠিতে যে 'শেষবারের যুদ্ধের' কথা বলা হয়েছে। সেটি ঘটেছিল ১৪ মে, ১৮৫৯-এ। চিঠি লেখার সময়ে অজ্ঞতাবশত জারোয়াদের মধ্য আন্দামানে বসবাসকারী বলা হয়েছিল। কিন্তু জারোয়ারা সে সময় দক্ষিণ ও পশ্চিম আন্দামান ঘেঁষে বাস করতেন, আজকের মত মধ্য আন্দামানে নয়। ইংরেজদের গুঁতোতেই আস্তে আস্তে মধ্য আন্দামানে সরে যান। এই বৃত্তান্ত অবশ্যম্ভাবী ভাবে মনে করিয়ে দেয় আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশ জুড়ে আরও অনেক বড় মাপে ও শত শত বছর ধরে পশ্চিমী 'সভ্যতার' ভয়াবহ, নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত (বহুক্ষেত্রে শঠতাপূর্ণ) জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্নকারী (Genocidal) সফল অবিরাম আক্রমণের হাড় হিম করা ইতিহাস।

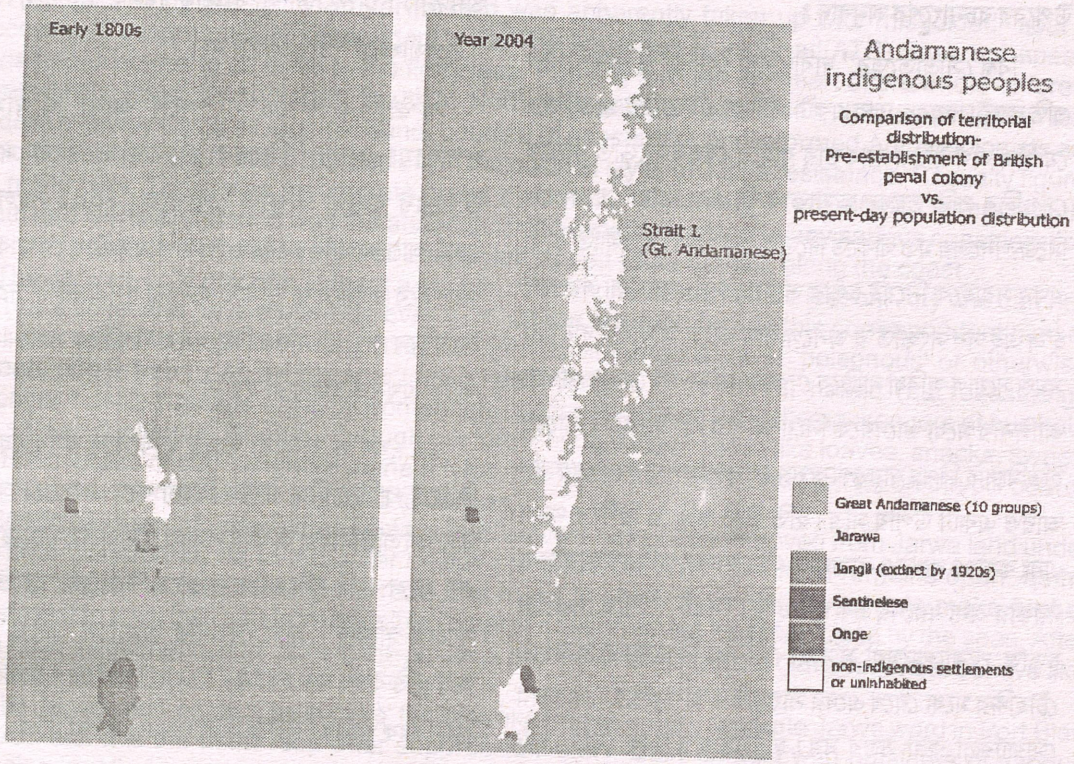

মূল রচনাংশ ঃ

JEREMY SEABROOK : **Diversity and pluralism**

The Statesman : Date : Jun 22, 2003

THE commitment of a "global community" to diversity and pluralism is most rigorously tested when it comes to its response to cultures that exist outside the global economy, and its willingness to permit them to remain there .....Politicians now speak a language of inclusivism, which seeks to extend to such people all the benefits of the modern world. In fact, this very desire to bring them within the embrace of the mainstream is yet another means of undermining their threatened autonomy. The defence of scattered, diffuse, and sometimes nomadic, groups requires another approcach. The prospect of cultural extinction cannot be addressed by even the most altruistic desire to deliver "justice" to people within the global system. Small tribal cultures cannot, by their nature, be "integrated" without total loss or sacrifice of their identity .....

This has been recently **recognised in India in relation to the recently-contacted Jarawa*** tribe of the Andaman islands : in 2002 the Supreme Court ordered the Andaman trunk road to be closed and that all settlers on their land be removed. ..... Although some settlers have been removed, the road remains open .....

.....institutionalised government violence against the occupants of forest and other fragile environments has been reduced. Representatives of tribal peoples have been elected to national governments. But this has not prevented a more "benign"assimilation, generally in the guise of bringing "civilisation" or "modern amenities" to people.

* *(bold highlights by me - S.G.)*

উপরের রচনাংশের অনুবাদ ঃ

"বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের" দাবীদাররা বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতার প্রতি কতটা দায়বদ্ধ তার একটা পরীক্ষা এইভাবেই হতে পারে যে বিশ্ব অর্থনীতির আওতার বাইরে যেসব সংস্কৃতি রয়েছে সেগুলির প্রতি তাদের মনোভাব কী এবং তারা সেগুলিকে নিজের নিজের মত থাকতে দিতে ইচ্ছুক কিনা। রাজনীতিবিদরা এখন সবাইকে নিয়েই চলার ভাষায় কথা বলছেন। এর অর্থ হ'ল এই সব সংস্কৃতি'র জনগোষ্ঠীর কাছে আধুনিক দুনিয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া। ঘটনা এই যে, মূল ধারার আঙ্গিনার মধ্যে তাদেরকে নিয়ে আসার এই ইচ্ছেটাই তাদের ইতিমধ্যেই বিপন্ন স্বায়ত্তশাসনের গোড়া আলগা করে দেওয়ার আরও একটা উপায় মাত্র। ইতি উতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং কখনও কখনও ভ্রাম্যমান এইসব জনগোষ্ঠীর রক্ষার জন্য দরকার অন্য ধরনের এক দৃষ্টিভঙ্গী। "ন্যায়" পৌঁছে দেওয়ার চূড়ান্ত পরোপোকারী সদিচ্ছা থেকেও বিশ্বজোড়া ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে রেখে এদের সাংস্কৃতিক অবলুপ্তির সম্ভাবনার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। চরিত্রগত ভাবেই ছোট ছোট আদিবাসী সংস্কৃতি পুরোপুরি বিনষ্ট না হয়ে তাদের "একাত্মীকরণ" হতে পারে না।

সাম্প্রতিক কালে সংস্পর্শে আসা আন্দামানের জারোয়া আদিবাসিদের ক্ষেত্রে ভারতে সম্প্রতি উপরের ধারণা স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০০২ সালে সুপ্রীম কোর্ট আদেশ জারি করেছে যে আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড বন্ধ করে দিতে হবে ও জারোয়া ভূমিতে অন্যান্য বসবাসকারীদের সরিয়ে দিতে হবে। ..... যদিও কিছু বসবাসকারীকে সরানো হয়েছে, সড়ক এখনও বন্ধ করা হয় নি। .....

.....বন ও অন্যান্য ভঙ্গুর পরিবেশে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় হিংসা কমে এসেছে। আদিবাসী মানুষের প্রতিনিধিরা জাতীয় সরকারে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এর ফলে আদিবাসী জনতার কাছে "সভ্যতা" বা "আধুনিক সুযোগ-স্বাচ্ছন্দ" এনে দেওয়ার আড়ালে আরও "সদয়" অর্ন্তভুক্তিকরণ বন্ধ হয় নি।

মোটা হরফ আমার। অনুদিত চিঠির শেষ অনুচ্ছেদ দ্রঃ- সু:গা:

জারোয়া প্রসঙ্গে খবরের কাগজে পাঠান অপ্রকাশিত চিঠি

30 June,2003

To
The editor,
The Statesman, Kolkata

The Jarwas, a 'Vanishing Tribe'

Sir,

Jeremy Seabrook's deeply perceptive article (Diversity and Pluralism, 22 June,2003) focuses on an issue which is seldom in public attention. What he has called the "benign" assimilation is, in effect, a "benign" as well as silent and slow genocide of indigenous people world over. But he is off the mark in his assumption, by implication, that India stands off as somewhat of an exception. In India, the issue relates primarily to the original inhabitants of Negroid stock in Andamans who were and are at Gatherers' Society stage. Thanks to the British in colonial India, Great Anamanese (GA) in South Andamans and the Onges in Little Andaman, together numbering thousands when British onslaught began in middle of the 19th century, were reduced to a little over hundred at present. On the verge of extinction through diseases and infertility, they are now re-located/rehabilitated in two separate camps. The glittering commercial hub (Aberdin Bazar) of modern Port Blair in S. Andamans was the place where the GA's gave their last battle, doomed to defeat, to invading British.

The Jarwas inhabiting Middle Andamans were more or less spared, possibly because the British considered South Andamans as both appropriate and adequate for their then limited purposes viz. to establish a penal settlement for Indian patriots and other prisoners.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বলাই (সুমিত চক্রবর্তী), শিবু (শিবপ্রসাদ নিয়োগী), যোগীন (সেনগুপ্ত), ভারতী (গাঙ্গুলী)।

The task left by the British in Jarwa land was apparently taken up with misguided zeal by successive Governments in Independent India. The Andaman Trunk Road(ATR) Seabrook speaks of, had no business to be there in the first place. Passing through the heart of the whole of forest-covered hilly Jarwa territory from South to North with seas on both sides, this about 300km long modern highway was built, against saner counsel of concerned, and informed Anthropologists and Sociologists, through brutal suppression, in the colonial style, of Jarwa resistance. Casualty figures are not known. There was a complete press black-out, involuntary or voluntary. Connecting the South and North Andamans was the stated purpose, which is not worth any serious consideration. The two zones were and are very well connected by sea route running along the coast.

The Jarwas, or at any rate at least a section of them, have learnt their lesson. Any one can now just buy a ticket and have a bus-ride over ATR. Only a few months ago this correspondent himself went that way. No more the fear of 'hostile' jarwas' ill-famed arrows- 'poisonous' or otherwise. Instead, one is free to 'enjoy' the spectacle of ebony black, curly haired, 'naked' (but reassuringly no longer 'hostile') Jarwas – mainly women and children – approaching the passengers at bus halts with spread out hands begging , through gestures, for 'civilized' foods like loaves, snacks, sweets etc. Passengers of course ignore inane advice (painted under 'Do's and Don'ts) on the bill boards along the way) – 'not to offer any food to Jarwas'

Seabrook is misinformed when he says that "settlers have been removed from Jarwa land under Supreme Court order. As to the order seeking to close the ATR, the "road remains open" as he correctly says. Far from closing the road, the move is afoot; it is reliably learnt, to make further investment to save the road from possible threat of erosion where it passes close by the seas. After such huge investments and more in the pipeline, it is naïve to expect the Government to behave like chastised school boy.

The Jarwas now enjoy 'son-in-laws' facilities like free bus-ride, separate Jarwa ward in Port Blair Hospital etc. It is the usual 'sop after suppression' story. Daily contact with outsiders of various agencies, public or private, are importing, along with newer diseases, new habits of 'civilization' such as new addictions, begging and the like. Surviving through millennia exclusively through their own efforts, these 'benefits' of civilization bestowed with vengeance on them in recent years, are tearing their social fabric apart leading to slow physical and spiritual death. ATR has become a harbinger and great facilitator of this 'civilizing' mission. A section of the Jarwas is resentful and is reportedly keeping themselves away from all contacts with outsiders. No body should be surprised if some day they simply are wiped out while making some suicidal attempt to settle scores, though the news is unlikely to reach us.

Clearly, contrary to what Seabrook believes, nothing in reality has been "recognized in India in relation to the recently contacted Jarwas"

Yours sincerely

(Subhas Chandra Ganguly)

B-22/8, Karunamoyee Housing Eatate,

Salt Lake City, Kolkata-70091

মূল ইংরেজী চিঠি'র অনুবাদ

সম্পাদক সমীপেষু,

দি স্টেটসম্যান, কলকাতা

30 জুন, 2003

জারোয়া - এক বিলীয়মান আদি জনগোষ্ঠী

মহাশয়,

জেরেমি সিব্রুক -এর সংবেদনশীল প্রতিবেদন ['বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতা' ('Diversity and Pluralism') - ২২ শে জুন, 2003] এমন একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে যা জনসাধারণের নজরে খুব কদাচিৎ আসে। যাকে তিনি বলেছেন "সদয়" ("benign") অন্তর্ভুক্তিকরণ (assimilation) তা

কার্যত দুনিয়া জুড়ে আদি অধিবাসীদের (Indigenous People) একই সাথে "সদয়", নিঃশব্দ ও ধীর গতিতে জাতিগত নিশ্চিহ্নিকরণ। তবে ভারত এ ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রকারান্তরে এমনটা ধরে নিয়ে তিনি এক্ষেত্রে বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টা প্রাথমিক ভাবে আন্দামানের সেই আদি অধিবাসীদের সাথে সম্পর্কিত, যাঁরা প্রচলিত নৃতত্বগত জাতিগত পার্থক্যীকরণের দিক থেকে 'নিগ্রো গোষ্ঠী ভুক্ত (Negroid Stock) ও সামাজিক সংগঠনের দিক থেকে 'শিকারী ও সংগ্রাহক' - এই সামাজিক স্তরে (Hunters & Gatherers' Society) ছিলেন ও আছেন। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ আন্দামানে ইংরেজদের হামলা পাকাপাকিভাবে শুরু হবার প্রাক্কালে 'বৃহৎ আন্দামানে' (Great Andaman) একসাথে 'গ্রেট আনদামানিজ' (Great Andamanese) নামাঙ্কিত একাধিক জাতিগোষ্ঠী ও 'ক্ষুদ্র আন্দামানে' (Little Andaman) 'ওঙ্গে' (Onge) নামের গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজদের দৌলতে সেই সংখ্যা আজ এসে দাঁড়িয়েছে একশর অল্প উপরে। ব্যাধি ও প্রজনন-অক্ষমতার কারণে এঁরা প্রায় বিলুপ্তির পথে। এদেরকে দু'জায়গায় দুই আলাদা শিবিরে পুনঃস্থাপিত/পুনর্বাসিত করা হয়েছে। দক্ষিণ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে আজকের যে ঝলমলে বাণিজ্য কেন্দ্র (আবের্ডিন বাজার) মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেটাই হল সেই স্থান যেখানে গ্রেট আন্দামানিজ্‌রা হানাদার ইংরেজদের শেষবারের মত যুদ্ধের মাধ্যমে ঠেকান'র চেষ্টা করেছিলেন। অনিবার্য ভাবেই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

মধ্য আন্দামান ঘেঁষে বসবাসকারী জারোয়াদের কম বেশী রেয়াত করা হয়েছিলো। এর কারণ সম্ভবত এমনও হতে পারে যে ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও অন্যান্য বন্দিদের জন্য শাস্তিমূলক শিবির বানাবার যে সীমিত লক্ষ্য তখনকার মত তাদের ছিল তার পক্ষে দক্ষিণ আন্দামানকে তারা উপযুক্ত ও যথেষ্ট মনে করেছিল।

স্বাধীন ভারতের একের পর এক সমস্ত সরকার জারোয়া ভূমিতে ইংরেজদের অসমাপ্ত কাজ যেন এক বিপথগামী উৎসাহের সাথে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যে আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড (ATR)-এর কথা সিব্রুক বলেছেন সে সম্পর্কে প্রথম কথাই হল এই যে এটার ওখানে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত, অরণ্য আচ্ছাদিত গোটা জারোয়া অঞ্চলের একেবারে হৃদয় ফুঁড়ে এগিয়ে চলা এই ৩০০ কিমি আধুনিক সড়কের আগাগোড়া উভয় দিক ধরেই সমান্তরাল চলেছে সমুদ্র। উদ্বিগ্ন ও তথ্যাভিজ্ঞ নৃতত্ববিদ, সমাজতত্ববিদ ইত্যাদিদের এই স ড়ক নির্মাণের বিরুদ্ধে সুস্থ পরামর্শ উপেক্ষা করে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং সম্পন্ন হয়েছে জারোয়া প্রতিরোধকে একেবারে আদি অকৃত্রিম ঔপনেবিশক কায়দায় নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নি। সংবাদ মাধ্যম পুরোপুরি নিঃশব্দ। কে জানে এই নৈঃশব্দ্য অনিচ্ছায় না স্বেচ্ছায়। এই সড়ক নির্মাণের যে ঘোষিত উদ্দেশ্য - উত্তর ও দক্ষিণ আন্দামানকে যুক্ত করা - তা কোনরকম গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার যোগ্যই নয়। উপকূল বরাবর সমুদ্রপথে এই দুই অঞ্চল চমৎকার ভাবে যুক্ত ছিল ও আছে। জারোয়ারা বা অন্তত তাদের একটা অংশ যা শিক্ষা নেবার নিয়েছে। যে কেউ এখন স্রেফ একটা টিকিট কিনে নিয়ে বাসে চেপে ATR-এর উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। মাত্র কয়েকমাস আগেই বর্ত্তমান পত্রলেখক নিজেই সেই পথ ধরে গেছে। 'হিংস্র' জারোয়াদের কুখ্যাত তীরের - তা সে 'বিষাক্ত' হোক আর না'ই হোক - ভয় আর নেই! বরং তার বদলে ঘন মসীবর্ণ ও কোঁকড়া চুলওয়ালা 'নগ্ন' (কিন্তু 'মারমুখি' আর নয়, কাজেই পুরো ভরসা!) জারোয়ারা - প্রধানতঃ নারী ও শিশু - হাত বাড়িয়ে এবং অঙ্গভঙ্গি করে 'সভ্য' খাবার ভিক্ষা করছে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য 'উপভোগ' করার পুরো স্বাধীনতা যে কারুর এখন রয়েছে! 'সভ্য' খাবার বলতে পাঁওরুটি, নোন্তা কিছু, মিষ্টি ইত্যাদি। পথের ধারে ধারে 'কি করা দরকার ও কি করা চলবেনা' (Do's and Don'ts) এই শিরোনামায় লটকান বিজ্ঞপ্তির মধ্যে রয়েছে 'জারোয়াদের কোন খাবার দেবেন না'। যাত্রীরা অবশ্যই এই অর্থহীন উপদেশ স্বাভাবিকভাবেই উপেক্ষা করে থাকেন।

সিব্রুক যখন বলেছেন "সুপ্রীম কোর্টের আদেশক্রমে জারোয়া ভূমি থেকে দখলকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে", তখন তিনি ভুল তথ্য পেয়েছেন। তবে ATR বন্ধকরে দেবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের যে আদেশ সে সম্পর্কে তিনি ঠিকই বলেছেন যে "রাস্তা এখনও খুলেই রাখা হয়েছে"।

বন্ধ করা তো দূর অস্ত, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেঁসে রাস্তার যেসব অংশ গেছে তাদের সম্ভাব্য ক্ষয় রোধের জন্য আরো অর্থ বিনিয়োগের তোড়জোড় চলছে।

এমন বিপুল বিনিয়োগ যেখানে আসার পথে, সেখানে সরকার স্কুলের তিরস্কৃত বালকের মত আচরণ করে ভুল সংশোধন করে নেবে এমন আশা করাটা অতি সারল্য হবে।

জারোয়ারা এখন 'জামাই-আদর' সুলভ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। যেমন, বিনি পয়সায় বাসে চড়া, পোর্ট ব্লেয়ার হাসপাতালে আলাদা জারোয়া ওয়ার্ড ইত্যাদি। এ হোল 'দমনের পর দান' - এর পুরোনো গল্প। রোজই সংশ্লিষ্ট নানা সরকারী-বেসরকারী বিভাগ/সংস্থার সূত্রে বহিরাগতদের সংস্পর্শে আসার ফলে নতুন নতুন অসুখের সাথে সাথে নতুন নেশা, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি 'সভ্যতা'র নানা 'সুবিধের'-ও আমদানী হচ্ছে। বিস্মৃত কোন অতীত কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে পুরোপুরিই নিজ চেষ্টায় টিকে আসার পরে সাম্প্রতিক কালে তাদের মাথার উপর বিপুল উৎসাহের সাথে অর্পিত 'সভ্যতার' এই সব উপহার তাদের সামাজিক বুনোটকে একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের শারিরীক ও আত্মিক মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কার্যত, ATR হয়ে উঠেছে 'সভ্যতায়নের' এই মহান কর্মোদ্যোগের অগ্রদূত। এমনও শোনা যাচ্ছে যে জারোয়াদের একাংশ ক্ষুব্ধ এবং তারা সর্বতোভাবে বহিরাগতদের সাথে সব রকম সংস্পর্শ এড়িয়ে চলছে। একদিন যদি হঠাৎ বকেয়া হিসেব চোকান'র উদ্দেশ্যে কোন (কার্যত) আত্মহত্যার তুল্য চেষ্টা করতে গিয়ে তারা একেবারে ধুয়ে মুছে যায় তো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যদিও সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছান'র সম্ভবনা নেই বললেই চলে।

"সাম্প্রতিক কালে সংস্পর্শে আসা .... জারোয়া ... দের ক্ষেত্রে .... ভারতে স্বীকৃতি পেয়েছে" সিব্রুকের এই বিশ্বাসের বিপরীতে স্পষ্টতই বাস্তবে কিছুই "স্বীকৃতি" পায় নি।

- সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী

(ই-মেল ঃ subhas_ganguly@yahoo.co.in)

B-22/8, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট,

সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

AIMBEE

36/1/1 Tangra Road, Kolkata 700 015

Contact No. : 9330446711 (2 p.m. to 8 p.m.)

Service for

- Pest control
- Dusting & Cleaning
- Book Preservation
- Extermination of White Ant Treatment
- Termite Control
- General Order Supply

References:

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office, etc.)

Colleges (Libraries & Laboratories)

Banks

Central & State Government Offices

গণিত ও সঙ্গীতে বারনৌলি ও বাখ্ পরিবার

নিখিলেশ পাল

[গণিত বা সঙ্গীতের রসে যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের কাছেও এক টুকরো রসালো ইতিহাস হাজির করেছেন লেখক- সঃ মঃ]

"গণিতের সব সূত্র জীবন্ত ও চিন্তাশীল এবং চলন্ত—সব
এদের জেনেছি শুধু, সৃষ্টি তো করিনি
'কৃপা করো' বললেই আবির্ভূত হয় আমার অন্তরে।"
(যে সব গণিত, বিনোদিনী কুঠী—কবি বিনয় মজুমদার)

দক্ষ বেহালাবাদক আইনস্টাইনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সঙ্গীত ও বিজ্ঞানকে তিনি কিভাবে মেলান। তাঁর উত্তর ছিল "Science is interesting ; Music is pleasing no doubt but music without science is nothing" এখানে উক্তিটির উল্লেখ, আর যাই হোক বাখ্ আর বারনৌলি পরিবারকে এক সূত্রে বাঁধার কোনো চেষ্টা নয়- শুধু 'সঙ্গীত ও বিজ্ঞান' শব্দ দুটিকে তুলে নেওয়া। বটবৃক্ষের বিস্তৃতিতে বিশাল বাখ্ পরিবার জার্মানী তথা ইউরোপের মার্গ সঙ্গীতজগতকে পুষ্ট ও আলোকিত করেছে টানা তিন শতাব্দী ধরে। তিনটি প্রজন্মে সংখ্যার হিসেবে কয়েক ডজন বাখ্ সঙ্গীতে মগ্ন ছিলেন। যদিও সুরস্রষ্টা এবং অরগ্যানবাদক জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ্ (1685-1750) এর আকাশচুম্বি প্রতিভার দ্যুতিতে অন্যেরা কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। জার্মানির অনেক জায়গায় বাখ্ শব্দটির অর্থই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল 'মিউজিশিয়ান', সেবাস্তিয়ান বাখের প্রথমা স্ত্রী মারিয়া বারবারা ও তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যানা ম্যাকডোলেনাকেও হার্পসিকর্ড বাদ্যযন্ত্রটি বাজানোতে পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন।

বাখেরা যেমন সঙ্গীতে বারনৌলি পরিবার তেমন গণিতে, একদম সমসাময়িক। বারনৌলিদের পূর্বপুরুষ, ক্যাথলিক নির্যাতনে 1583 সালে হল্যান্ড থেকে পালিয়ে বসবাস করেন শান্ত, নির্জন, রূপসী রাইন নদীর তীরে ইউনিভার্সিটি-শহর বেসেল্-এ যেখানে সুইৎজ্যারল্যান্ড, জার্মান ও ফ্রান্সের সীমানা মিশেছে। বণিক-বৃত্তিতেই তাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নব প্রজন্ম আকৃষ্ট হয় বিজ্ঞানে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে তাঁরা বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদটি অলঙ্কৃত ('দখল') করেছিলেন। এই পরিবারের প্রথম গণিতজ্ঞ জ্যাকব–I বারনৌলি (1654-1705) বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র হলেও বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারিবারিক বণিক বৃত্তিতে করনিকের কাজ না করে দীর্ঘ চর্চায় গণিত, জোতির্বিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যায় নিজেকে পারদর্শী করে তোলেন। এবং সদর্পে বলেন 'against my fathers will, I study the stars', গণিত চর্চার জন্য দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতেন এবং বিজ্ঞান জগতের লোকেদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবার্ট বয়েল ও রবার্ট হুক। তিনি 1683 তে বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনায় যোগ দেন, আমৃত্যু এই পদে ছিলেন। তার ছোটভাই জোহান-I একইভাবে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ না দিয়ে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেসেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক হন— 'পেশী সংকোচন' নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরস্ ডিগ্রি অর্জন করেন কিন্তু যথারীতি ডাক্তারি পেশা ছেড়ে ক্যালকুলাসে আকৃষ্ট হন এবং বড় ভাইয়ের সাথে চর্চা করে আচিরেই গণিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

পরবর্তিকালে গণিতের একটি গবেষণাপত্র 'তার না জ্যাকবের' কার নামে প্রকাশ হবে এই নিয়ে বড় ভাই জ্যাকবের সাথে তীব্র কলহে জড়িয়ে, তীব্র অভিমানে বেসেল ছেড়ে চলে যান হল্যান্ডের গ্রোনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে— গণিত অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে, এই প্রতিজ্ঞায় যে আর বেসেলে ফিরবেন না। তবে দাদার মৃত্যুর পর বেসেলে ফেরেন গণিতের সেই অধ্যাপক পদেই যোগ দিতে। গোটা বারনৌলি পরিবারে মোট 13 জন গণিতজ্ঞের মধ্যে তিন জন গণিতের জগতে অসাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। গণিত চর্চায় বারনৌলি পরিবারের খ্যাতি যত বাড়তে থাকল, অন্যকে বাদ দিয়ে নিজের নামে গবেষণা পত্র প্রকাশ নিয়ে তাদের অন্তর্কলহও সমানতালে-ই বাড়তে লাগল। ঈর্ষাজনিত অন্তর্কলহ গালাগালির স্তরে চলে যেত এবং ঝগড়া করতে করতে তারা খাওয়ার টেবিল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেন। গণিত ঐতিহাসিকদের মতে তাকে আর যাই হোক 'সাইন্টিফিক ডিসকাসন' বলা যায় না। কারো কারো মতে তাদের কলহ রাস্তার মাতালদের খিস্তি খেউরের সাথেই তুলনীয় ছিল। এত সব পারিবারিক বিশৃঙ্খলার পরেও বারনৌলিদের গণিত চর্চায় কখনও ভাটা পড়েনি। অতীতে অনেক সময় দেখা গেছে সাময়িক অশান্তি ও তর্ক বিতর্কের পরও তারা আবার সব ভুলে গিয়ে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানে একসাথে আবার আলোচনায় বসেছে। জোহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ড্যানিয়েল বারনৌলির (1700-1782) সাথে 'প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস'র তৃতীয় পুরস্কারটি যৌথভাবে পাওয়ায়, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কারণ এই গবেষণাপত্রটি

নাকি তারই মস্তিষ্ক প্রসুত। এবং এ কারণে পুত্রকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। সেই তুলনায় "বাখ্ সম্প্রদায়" ছিল শান্তিময়, নিরহঙ্কারী ও সঙ্গীত সুষমায় নিমজ্জিত।

ক্যালকুলাস আবিষ্কারে নিউটন-লাইবনিৎস বিতর্কে পুত্র ড্যানিয়েল ছিলেন নিউটনের পক্ষে, জোহান ছিল লাইবনিৎস-এর সমর্থক। প্রসঙ্গত প্রবাহী বায়ু ও তরলের ধর্ম নিয়ে এই ড্যানিয়েলের সূত্র-ই উড়োজাহাজ নির্মানের ভিত্তি। গণিতের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার সুবাদে পরবর্তিকালে তিনি মোট দশবার প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস-এর পুরস্কার পান। ড্যানিয়েলের জীবনের একটি মজার ঘটনা-একবার প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে এক ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতায় বিনয়ের সাথে নিজের পরিচয় দেন "আমি ড্যানিয়েল বারনৌলি"। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে নিজেকে জাহির করে তাঁকে খোচা দিচ্ছেন ভেবে ব্যক্তিটি বিরক্তিতে উত্তর দেন... "এবং আমি স্যার আইজ্যাক নিউটন"। অনিচ্ছাকৃত প্রশস্তি হিসেবে গ্রহণ করে ড্যানিয়েল এতে খুশিই হন। ড্যানিয়েলও তাঁর পিতা জোহানের মতই 'ভুল করে', চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়ে ফুসফুসের ক্রিয়া প্রণালীর উপর গবেষণাপত্র লিখে 'ডক্টর'স ডিগ্রি নিয়েও সেন্ট পিটারর্সবার্গ এ গণিত অধ্যাপক। 1733-এ বেসেলে ফিরে প্রথমে উদ্ভিদবিদ্যা পরে অ্যানাটমি ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ। সেকালে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও ভৌতবিজ্ঞানের শাখাগুলি অত পৃথক ছিল না।

লাইবনিৎসের সাথে বারনৌলিরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং অনেক অধিক বয়স্ক পেশাদার গণিতজ্ঞদের এ বিষয়ে প্রাইভেট টিউশান দিতেন। বাখেদের মত বারনৌলিরাও ভাল শিক্ষক ছিলেন এবং তাদের প্রচেষ্টাতেই সদ্য আবিষ্কৃত (নব্য) ক্যালকুলাস ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তখনও এ বিষয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। এল হসপিটাল-ই প্রথম ক্যালকুলাস'-এর বই লেখেন, "Analyse des infiniment petits" (অ্যানালিসিস অফ্ দি ইনফাইনাইটাল স্মল) প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় 1696-এ। এই পুস্তকে তিনি '0/0' (শূন্য/শূন্য), ∞/∞, $\infty - \infty$ ইত্যাদির অনির্ণীত রূপের (ইনডিটারমিনেট ফর্ম), মর্ম উদ্ধারে (মূল্যায়ন) যে "সমাধান" ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা পরে জানা যায় ; এটা আসলে ছিল জোহান বারনৌলির। [∞ = অসীম]

অন্যের আবিষ্কৃত গবেষণা পত্র নিজের নামে প্রকাশ করাকে বলা হয় plagiarism (কুম্ভীলক বৃত্তি)। কিন্তু এক্ষেত্রে দু'জনের লিখিত (বৈধ) চুক্তি হয়েছিল যে জোহানের এরকম কোন আবিষ্কৃত তত্ত্ব এল' হসপিটাল চাইলে নিজের নামে চালাতে পারেন। যেহেতু জোহানকে তিনি বিনা পয়সায় প্রাইভেট টিউশান পড়ান। তবে স্মরণযোগ্য জোহান কিন্তু ছ'বছরের বড় 'গুরু' এল' হসপিটালকে ক্যালকুলাস বিষয়টি শেখাতেন।

ওদিকে জ্যাকবের গণিত জীবনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য সম্ভাবনাবাদ নিয়ে লেখা রচনাবলী– ars conjectandi (the Art of congecture) তার মৃত্যুর পর 1723 সালে প্রকাশিত হয়। এক অসীম সংখ্যার কল্পনাকে দার্শনিক ভিত্তি করে, গাণিতিক যুক্তির মোড়কে সম্ভাবনাবাদ তত্ত্বের যে প্রাথমিক নীতি ছকেছিলেন (বিধান দিয়েছিলেন) তা আজ পর্যন্ত কিঞ্চিত বিতর্কিত হলেও অ-প্রমাণও করা যায়নি।

হাজার হাজার বছর ধরে যে সব জ্যামিতিক বক্রতায় (অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত... আর্কিমিডিস চক্র, 1637-এর দেকার্তে'র উদ্ভাবিত সাইক্লয়েড ও লগারিদমিক স্পাইরাল...) গণিতবিদ, শিল্পী (চিত্রকর) ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা (naturalists) আকৃষ্ট হয়েছেন তাদের সেরা ও জেকব বারনৌলির সবচেয়ে প্রিয় লগারিদ্‌মিক স্পাইরাল ; আদর করে নাম রেখেছিলেন 'স্পাইরা মিরাবিলিস' অর্থাৎ 'চমৎকার শঙ্খবৃত্ত'। সামুদ্রিক শামুক নটিলাস, সূর্যমুখি ফুলের বীজের বিন্যাস এমনকি অধুনা আবিষ্কৃত স্পাইরাল গ্যাল্যাক্সিতেও এই লগারিদমিক স্পাইরালের ছোট্ট সমীকরণকে দেখা যায়।

পাশ্চাত্য মন পরিবর্তন চাইল, একই স্কেলের সীমানায় স্বরগুলিকে ঘোরানো ফেরানোয় যেন একঘেয়েমি। যদি ক্রমবর্ধমান উচ্চতর কম্পাঙ্কের দুরবর্ত্তী অকটেভগুলোর বিচরণক্ষেত্রে স্বরগুলির বিন্যাস ও বিস্তারকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যতায় আরও সূক্ষাতিসূক্ষ 'রঙ'এর সমাবেশ হতে পারে। হার্পসিকর্ড, অরগ্যান ও সদ্য আবিস্কৃত পিয়ানোতে তার সুবিধা রয়েছে। 1722 নাগাদ সিবাস্তিয়ান বাখ্ 48টি প্রিলুডের (যেমন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে ব্যবহৃত আলাপ, তেলেনা বা ভূমিকা) প্রস্তুতিতে তার বাদ্যযন্ত্রগুলির সবকটি চাবিকেই ব্যবহার করতে চেয়ে প্রচলিত স্বরগ্রাম (Musical Scale) পদ্ধতিতে কিছু অসুবিধা লক্ষ্য করেন। তাই তিনি এই 'অকটেভ' কে 12 টি সমান ভাগে (সেমিটোন) ভেঙে দেন, যেখানে পর্যায়ক্রমিক স্বরগুলির কম্পাঙ্কের অনুপাতগুলোও সমান। যার মান 1.0596। একটি ধ্রুবকসংখ্যা! এই অবস্থায় দূরবর্ত্তী অকটিভগুলিতে প্রতিবেশি স্বরগুলির অবকাশে কোন 'ছন্দপতন' ঘটল না। এই নতুন পদ্ধতির নাম দেন 'সমবিভাগীয় সমীকৃত স্কেল' (Equally or well tempered scale) সেবাস্তিয়ানের সাথীরা এই পরিমার্জিত স্কেলকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্যাকব বারনৌলির লগারিদমিক স্পাইরালের সাহায্যে নিঁখুত ও সুষম গাণিতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ কারনে শঙ্খবৃত্তটিকে

অনেকে 'মিউজিক্যাল ক্যালকুলেটর' ও বলেন। এই নব্য পদ্ধতিটি বিশ্বজুড়ে গৃহীত হয়।

"এইভাবে দেখা যায় পৃথিবীর সবকিছু পরস্পর সম্পর্কিত, ফলে

সমগ্র পৃথিবী মাত্র একটি সমীকরণ, এ সমীকরণে

পৃথিবীর সবকিছু অন্তর্ভুক্ত আছে" (সমীকরণ—কবি বিনয় মজুমদার)

এই শঙ্খবৃত্তটির জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যে ও অনন্যতায় জ্যাকব বারনৌলি এক অতীন্দ্রয়-অনুভূতিতে বিমোহিত হয়েছিলেন। তার কারণ যে কোন জ্যামিতিক রূপান্তরে শঙ্খবৃত্তটিকে গোটানো (involute) বা বিবর্ত্তিত (evolute) করা হোক, প্রতিফলিত বা

বেসেলে জ্যাকব বারনৌলির সমাধির স্মৃতি-প্রস্তরে ভুল করে খোদিত 'আর্কিমিডিস স্পাইরাল'

প্রতিসারিত হোক, শঙ্খবৃত্তটির চেহারা অবিকৃত থাকে। তিনি এই লগারিদমিক স্পাইরালকে এক বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার প্রতীকরূপে ভেবেছিলেন অর্থাৎ যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় অবিচল থাকা। এমনকি মানবদেহ মৃত্যুর পর যদিও পরিবর্ত্তিত হয় এই লগারিদমিক স্পাইরাল বা শঙ্খবৃত্তের ছোঁয়ায় তা আবার নিঁখুত ও যথাযথ নিজস্বতায় ফিরে আসবে, এমন বিশ্বাস-ই বোধহয় তার হয়েছিল। আর্কিমিডিসের মত জ্যাকব বারনৌলির শেষ ইচ্ছা হয়েছিল তার মৃত্যুর পর কবরের স্মৃতি ফলকে শঙ্খবৃত্তটি খোদাই করা হবে। আর তাকে পরিবেষ্টিত করে খচিত হবে এই লাইনটি—'Eadem mutata resurgo'—অর্থাৎ Though changed, I shall arise the same.

কিন্তু স্থপতি অজ্ঞতাবশত অথবা খোদাই করার কাজ কিছুটা সহজ করার জন্য যা " এঁকেছিলেন" তা ছিল আর্কিমিডিস উদ্ভাবিত অন্য একটি "স্পাইরাল"— যার গাণিতিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা ভিন্ন। জ্যাকব বারনৌলির আত্মা তাতে শান্তি পায়নি।

এই পরিবারের শেষতম গাণিতিক-বারনৌলি হচ্ছে,

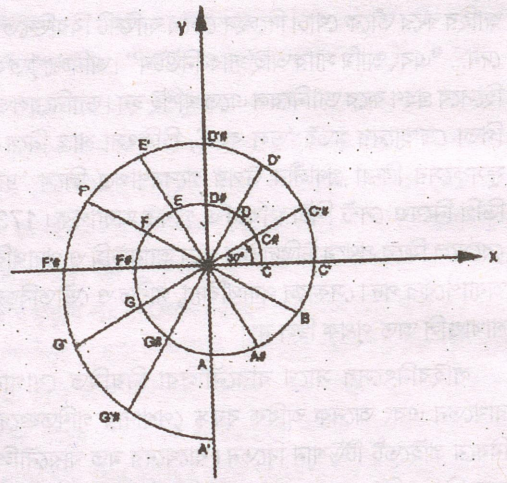

সেবাস্তিয়ান বাখ্ প্রস্তাবিত সমবিভাগীয় সমীকৃত স্কেলের ১২টি স্বরের অবস্থানকে নিখুঁত ভাবে নির্দেশিত করছে 'লগারিদমিক স্পাইরাল'টি।

ড্যানিয়েলের ভাই জোহান-II-র প্র-পৌত্র জোহান গুস্তভ (1811-1863)। কাকতালিয়ভাবে প্রায় একই সময়ে 1871 সালে শেষ 'সাঙ্গীতিক-বাখ্' এর মৃত্যুতে তিন শতাব্দীর ইতিহাস থমকে যায়! এখানেই প্রায় একই সময়ে দুটি পরিবারেরই প্রজন্মরও পরিসমাপ্তি।

তথ্য সূত্র ঃ

১. *The Story of A Number By ELI MAOR, Universities Press*

২. *Lectures on Music Appreciation Course Volume II— West Bengal State Music Academy. 1989*

৩. *Lives of the great composers volume I, Edited by A.L. Bacharach ; Pelican Books*

৪. *সাঙ্গীতিক শব্দবিজ্ঞান ডঃ সমীর কুমার ঘোষ*

৫. *বিনয় মজুমদার ; অনুধ্যানে অনুভবে ; সম্পাদনা অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার— সুমিত চক্রবর্তি (বলাই), রবীন ব্যানার্জি, শ্রীমতী শম্পা দত্ত।

ভারতের জলসংকট

কল্যাণ রুদ্র

[তথ্যের নিরিখে ভারতের জলের অবস্থা কেমন? জটিল একটি বিষয়কে প্রাঞ্জল করেছেন গবেষক নিবন্ধকার। হদিস দিয়েছেন ভারতের সুষ্ঠু জল - সংরক্ষণ ও ব্যবহার নীতির। - সঃ মঃ]

পৃথিবীর নানা প্রান্তে জলের সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন 'বিংশ শতাব্দীতে তেলের জন্য যুদ্ধ হ'ল, একবিংশ শতাব্দীতে জলের জন্য যুদ্ধ হবে।' ২০০২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করেছিল নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু জল ব্যবহারে বৈষম্য পৃথিবী-জোড়া। ইউরোপে একজন নাগরিককে প্রতিদিন ২০০ লিটার জল দেওয়া হয় আর একজন আমেরিকানের জন্য বরাদ্দ ৪০০ লিটার। অথচ উন্নয়নশীল দেশের ১৫০ কোটির বেশি মানুষ প্রতিদিন পাঁচ লিটার জলও পাননা। ২০০৬ সালে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়ঃ

- বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৬০ কোটি থেকে বেড়ে ৬০০ কোটি অতিক্রম করেছে। ওই সময়ের মধ্যে জলের চাহিদা বেড়েছে ছয়গুণ। ১৯০০ সালে পৃথিবীতে মোট জলের চাহিদা ছিল ৫৮০ ঘন কি.মি., ২০০০ তা বেড়ে হয়েছিল ৩৭০০ ঘন কিমি.।
- পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না আর ২৬০ কোটি মানুষের কোন শৌচালয় নেই।
- পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এখন জল সংকটে বিব্রত।
- প্রতি বছর প্রায় ২৫ কোটি মানুষ জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হন, মৃত্যু হয় এক কোটি।
- উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর ১৮ লক্ষ শিশু পেটের অসুখে মারা যায়।
- পৃথিবীতে একবছরে যত জল ব্যবহৃত হয় তার ৬৯ শতাংশ হল সেচের জল। শিল্প ও গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে ২৩ ও ৮ শতাংশ জল।
- বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর মোট সেচ সেবিত এলাকার ব্যাপ্তি ৫ কোটি হেক্টর থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬.৭০ কোটি হেক্টর। কিন্তু সেচের জন্য সংরক্ষিত জলের প্রায় ৬০ শতাংশ বাষ্পীভবন ও খালের নীচের মাটির শোষনে অপচয় হয়, আরও প্রায় ২০ শতাংশ জল ক্ষেতে নষ্ট হয় অর্থাৎ ফসলের কোন কাজে লাগে না।
- উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ লক্ষ মহিলা ও মেয়েরা প্রতিদিন দূর থেকে জল আনার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেন ফলে অন্য সামাজিক কাজ করতে পারেন না।
- শিশুদের জলবাহিত অসুস্থতার জন্য প্রতিবছর ৪৪.৩০ কোটি স্কুল-দিন নষ্ট হয়।

সব ধরনের ব্যবহার মিলিয়ে একটি মানুষের বছরে অন্তত ১৬৬৭ ঘন মিটার জলের প্রয়োজন হয়। কোন এলাকায় প্রাপ্য জলের পরিমাণ ওই মাত্রার কম হলে সেখানে জলের অভাব (Crisis) আছে বলে ধরা হয়। যদি কোন এলাকায় মাথাপিছু প্রাপ্য জলের পরিমাণ ১০০০ ঘন মিটারের কম হয় তবে সেখানে জলের সংকট (Scarcity) দেখা দিয়েছে বলে ধরা হয়, যদি কোথাও প্রাপ্য জলের পরিমাণ মাথাপিছু ৫০০ ঘন মিটারের কম হয় তবে তাকে গভীর সংকট বলা হয়। যেহেতু পৃথিবীতে জলের যোগান সীমিত আর জনসংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে তাই মাথাপিছু জলের বরাদ্দ ক্রমশ কমছে। ১৯৫১ সালে বছরে একজন ভারতীয় নাগরিকের প্রাপ্য জলের পরিমাণ ছিল ৫১৭৭ ঘন মিটার, ২০০১ সালে তা কমে হয়েছে ১৮২০ ঘন মিটার। ২০২৫ ও ২০৫০ সালে আরও কমে হবে যথাক্রমে ১৩৪১ ও ১১৪০ ঘন মিটার।

ভূউষ্ণায়ন ও বিপন্ন জলসম্পদঃ

পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে একথা তর্কাতীত সত্য, আর এই উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে নানা ক্ষেত্রে। বদলে যাচ্ছে জলচক্রের

কার্যকারণ ও সম্বন্ধ। ভূউষ্ণায়নের প্রভাবের পার্থক্য ঘটছে নানা এলাকায়।

কয়েকটি লক্ষণীয় পরিবর্তন যা ঘটছে তা হল ঃ

- উত্তাপ বাড়ার সাথে সাথে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বাড়ছে।
- উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের বলয় পরিবর্তিত হচ্ছে। ১০° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকায় বৃষ্টি কমছে কিন্তু আরও উত্তরে অর্থাৎ উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়ছে।
- গত চার দশকে পৃথিবীতে শুখা এলাকার বিস্তৃতি আগের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়েছে।
- উত্তাপ বাড়ার ফলে পার্বত্য অঞ্চল ও মেরুপ্রদেশের হিমবাহ ক্রমশ গলে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের উপরের জলের গঠন (structure) ও গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটছে।
- ক্রান্তীয় অঞ্চলে কম সময়ে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে খরা ও বন্যার প্রকোপ।
- বিজ্ঞানীদের ধারনা ২১ শতকের মাঝামাঝি উচ্চ অক্ষাংশ ও আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রাপ্য জলসম্পদ বর্তমানের তুলনায় ১০-৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু মধ্য অক্ষাংশ ও শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে জলসম্পদ ১০-৩০ শতাংশ কমে যাবে।
- উপকূল অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার ফলে ভৌমজলে লবণতার মাত্রা বাড়বে, বিপন্ন হবে মানবসভ্যতা ও বাস্তুতন্ত্র।
- বৃষ্টিপাতের বলয় পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ২০৫০ সালে পৃথিবীর ২০-২৯ শতাংশ এলাকায় জলের বর্তমান সংকট কমবে কিন্তু ৬২-৭৬ শতাংশ এলাকায় সংকট আরও গভীর হবে।
- ইতিমধ্যে উত্তাপ বাড়ার ফলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা কমছে, প্রভাব পড়ছে কৃষি কাজে ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের জীবনে।

ভারতের জলসম্পদ ঃ

পৃথিবীর স্থলভাগের ২.২০ শতাংশ এলাকা ভারতীয় ভূখন্ড যেখানে পৃথিবীর প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষ বসবাস করেন, আর মোট জলসম্পদের চার শতাংশ এদেশে পাওয়া যায়। ভারতের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১৪৯ মিমি-এর প্রায় ৭৮ শতাংশ হয় বর্ষার চার মাসে অর্থাৎ ১৫ জুন থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। ব্যাতিক্রম শুধু তামিলনাড়ু যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০৯০ মিমি এবং এই বৃষ্টির মাত্র ২৯ শতাংশ হয় বর্ষার চার মাসে বাকী ৭১ শতাংশ পাওয়া যায় বাকী আট মাসে। উল্লেখ্য অবস্থানগত কারণে একমাত্র তামিলনাড়ুতেই বছরে দু'বার বৃষ্টি হয়। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় মেঘালয়ে (৫৫৮১ মিমি) আর সবথেকে কম বৃষ্টি হয় রাজস্থানে (৪৩২ মিমি)। যেসব রাজ্যে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয় তার মধ্যে গোয়া (৩২৯৮ মিমি), কেরালা (৩০৯৫ মিমি), আন্দামান (২৭৪৩ মিমি) এবং অরুণাচল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুখা মরশুমে কম বৃষ্টিপাত হয় এমন রাজ্যগুলি হল গুজরাত (১১ মিমি), দাদরা ও নাগর হাভেলি (১৩ মিমি), দমন ও দিউ (১৪ মিমি), রাজস্থান (৩৬ মিমি) ও মহারাষ্ট্র (৯৩ মিমি)। পাক-কাশ্মীর ও আকসাই চীন বাদে যে ৩১.৬৭ লক্ষ বর্গকিমি এলাকা ভারত সরকারের অধীন সেখানে বছরে ৩৬৪৫.৫২ ঘন কিমি জল বৃষ্টিপাত হয়ে ঝরে পড়ে। এই জল সম্পদের মধ্যে ২৮৪১.৪৫ ঘন কিমি জল পাওয়া যায় বর্ষার চার মাসে আর মাত্র ৮০৪.০৭ ঘন কিমি জল পাওয়া যায় বাকী আট মাসে। নীচের সারনী থেকে ভারতে বৃষ্টিপাতের স্থানগত ও সময়গত বৈষম্যের চিত্রটি পাওয়া যায়।

ভারতে বৃষ্টিপাত ও জল সম্পদের বন্টন

রাজ্য	আয়তন (বর্গ কিমি)	জনসংখ্যা	বৃষ্টিপাত (মিমি)			জলের পরিমাণ (ঘন কিমি)		
			বর্ষাকালে	শুখা মরশুমে	বার্ষিক	বর্ষাকালে	শুখা মরশুমে	বার্ষিক
আন্দামান ও নিকোবর	৮২৪৯	৩৫৬১৫২	১৫৩২	১২১১	২৭৪৩	১২.৬৪	৯.৯৯	২২.৬৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৭৫০৬৯	৭৬২১০০০৭	৬৫২	৩৩০	৯৮২	১৭৯.২৯	৯০.৮৯	২৭০.১৮
অরুনাচল প্রদেশ	৮৩৭৪৩	১০৯৭৯৬৮	১৬৭৬	৮৭১	২৫৪৮	১৪০.৩৯	৭২.৯৬	২১৩.৩৬
আসাম	৭৮৪৩৮	২৬৮৬৮১৬৩	১৩৪৮	৭৬৬	২১১৪	১০৫.৭১	৬০.০৯	১৬৫.৮০
বিহার	৯৪১৬৩	৮২৯৯৮৫০৯	১০২৭	১২৬	১১৫৪	৯৬.৭৩	১১.৯১	১০৮.৬৪
চন্ডিগড়	১১৪	৯০০৬৩৫	৮২৪	২১৮	১০৪২	০.০৯	০.০২	০.১২
ছত্তিশগড়	১৩৬০৩৪	২০৮৩৩৮০৩	১০৫৯	১৩৬	১১৯৫	১৪৪.০১	১৮.৫৫	১৬২.৫৬
দাদরা ও নগর হাবেলি	৪৯১	২২০৪৫১	২৪৭০	১৩	২৪৮৩	১.২১	০.০১	১.২২
দমন ও দিউ	১১২	১৫৮২০৪	২৩২২	১৪	২৩৩৬	০.২৬	০.০০	০.২৬
দিল্লি	১৪৮৩	১৩৮৫০৫০৭	৫২৫	১৫২	৬৭৭	০.৭৮	০.২২	১.০০
গোয়া	৩৭০২	১৩৪৭৬৬৮	৩০১১	২৮৮	৩২৯৮	১১.১৫	১.০৬	১২.২১
গুজরাট	১৯৬০২৪	৫০৬৭০০১৩	৮৫৬	১১	৮৬৭	১৬৭.৮২	২.১৫	১৬৯.৯৭
হরিয়ানা	৪৪২১২	২১১৪৪৫৬৪	৩৯০	১২২	৫১১	১৭.২৩	৫.৩৮	২২.৬১
হিমাচল প্রদেশ	৫৫৬৭৩	৬০৭৭৯০০	৭১২	৩৬৪	১০৭৬	৩৯.৬৪	২০.২৫	৫৯.৮৯
জম্মু ও কাশ্মির	১০১৩৮৭	১০১৪৩৭০০	২৮৮	৩৩৯	৬২৮	২৯.২৩	৩৪.৪০	৬৩.৬৩
ঝাড়খন্ড	৭৯৭১৪	২৬৯৪৫৮২৯	১০৪১	১৬৩	১২০৪	৮২.৯৮	১২.৯৭	৯৫.৯৬
কর্নাটক	১৯১৭৯১	৫২৮৫০৫৬২	৮৬৪	৩২২	১১৮৬	১৬৫.৭৭	৬১.৭৫	২২৭.৫২
কেরালা	৩৮৮৬৩	৩১৮৪১৩৭৪	২০৭৮	১০১৭	৩০৯৫	৮০.৭৬	৩৯.৫৪	১২০.২৯
লাক্ষাদ্বীপ	৩২	৬০৬৫০	১০৪৮	৭৭৯	১৮২৭	০.০৩	০.০২	০.০৬
মধ্যপ্রদেশ	৩০৮০০০	৬০৩৪৮০২৩	৮৮৬	৬২	৯৪৮	২৭২.৯৬	১৮.৯৮	২৯১.৯৪
মহারাষ্ট্র	৩০৭৭১৩	৯৬৮৭৮৬২৭	১০৯৫	৯৩	১১৮৮	৩৩৬.৮১	২৮.৬৭	৩৬৫.৪৭
মনিপুর	২২৩২৭	২২৯৩৮৯৬	৭৫৩	৫৩০	১২৮৪	১৬.৮২	১১.৮৪	২৮.৬৬
মেঘালয়	২২৪২৯	২৩১৮৮২২	৪০১৫	১৫৬৬	৫৫৮১	৯০.০৫	৩৫.১২	১২৫.১৭
মিজরাম	২১০৮১	৮৮৮৫৭৩	১৫৩৯	৫৯৩	২১৩১	৩২.৪৪	১২.৪৯	৪৪.৯৩
নাগাল্যাণ্ড	১৬৫৭৯	১৯৯০০৩৬	৮৪৪	৪৪৬	১২৯০	১৩.৯৯	৭.৪০	২১.৩৯
ওড়িশা	১৫৫৭০৭	৩৬৮০৪৬৬০	১৩৩৯	২৬৬	১৬০৪	২০৮.৪৩	৪১.৩৫	২৪৯.৭৯
পন্ডিচেরী	৪৭৯	৯৭৪৩৪৫	৩০১	১২৬৮	১৫৬৯	০.১৪	০.৬১	০.৭৫
পাঞ্জাব	৫০৩৬২	২৪৩৫৮৯৯৯	৪১৫	১৩৫	৫৫০	২০.৮৯	৬.৭৯	২৭.৬৯
রাজস্থান	৩৪২২৩৯	৫৬৫০৭১৮৮	৩৯৬	৩৬	৪৩২	১৩৫.৫০	১২.৩৯	১৪৭.৯
সিকিম	৭০৯৬	৫৪০৮৫১	১৮৬৬	৯৪৮	২৮১৩	১৩.২৪	৬.৭২	১৯.৯৬
তামিলনাড়ু	১৩০০৫৮	৬৩৯৫২৩৭৯	৩১৩	৭৭৭	১০৯০	৪০.৭১	১০১.১০	১৪১.৮১
ত্রিপুরা	১০৪৯২	৩১৯৯২০৩	১৫১৭	৮২০	২৩৩৭	১৫.৯১	৮.৬১	২৪.৫২
উত্তরপ্রদেশ	২৪০৯২৮	১৬৬১৯৭৯২১	৭১৮	৮৫	৮০২	১৭২.৯৩	২০.৪০	১৯৩.৩৩
উত্তরাখন্ড	৫৩৪৮৪	৮৪৮৯৩৪৯	১২৬১	২৩৯	১৫০১	৬৭.৪৬	১২.৮১	৮০.২৭
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮৭৫২	৮০১৭৬১৯৭	১৪৩৬	৪১৩	১৮৪৮	১২৭.৪৩	৩৬.৬২	১৬৪.০৫
সারা ভারত	৩১৬৭০২০	১০৩০৪৯৫৭২৮	৮৯৫	২৫৩	১১৪৯	২৮৪১.৪৫	৮০৪.০৭	৩৬৪৫.৫২

তথ্যসূত্র ঃ ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর, (২০০৯)

ভারতে প্রাপ্য জলের পরিমান নিয়ে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এমনকী সরকারি নানা নথিপত্রেও ভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এই বিভ্রান্তির একটি মূল কারণ হল ভারতের আয়তন ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের যে তথ্য দেওয়া হয় তার মধ্যেই কিছু গড়মিল আছে। ২০০৭ সালে ভারতের যোজনা কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে এদেশের মোট আয়তন ৩২.৮৭ লক্ষ বর্গকিমি আর বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ১১৭০ মিমি। এই দুই তথ্যকে মেনে নিয়ে হিসেব করলে দেখা যায় এদেশে বাৎসরিক জলসম্পদ হল ৩৮৩৮ ঘন কিমি। কিন্তু ভারত সরকার প্রকাশিত ভারতের ৩৫টি অঙ্গরাজ্যগুলির আয়তন যোগ করলে দেখা যায় (ইন্ডিয়া ২০০৮) এদেশের প্রকৃত আয়তন ৩১ লক্ষ ৬৭ হাজার ২০ বর্গ কিমি। উল্লেখ্য এই আয়তন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আকসাই চীনের এলাকা বাদে। অর্থাৎ প্রায় ১২০,২৪৩ বর্গকিমি এলাকা বেদখল হয়ে আছে যেখানে ভারত সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং জলসম্পদের সঠিক হিসেব করতে হলে ওই অধিকৃত এলাকা বাদ দেওয়াই শ্রেয়। দ্বিতীয়ত ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে সর্বশেষ যে তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে তৈরী সারণীটি লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে ২০০২-২০০৮ সালের মধ্যে এদেশে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১১৪৯ মিমি। আয়তন ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের এই সংশোধিত তথ্য মেনে নিয়ে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে এদেশে প্রাপ্য জলের পরিমাণ ৩৬৪৫.৫২ ঘন কিমি। কিন্তু এত জল আমাদের ব্যবহারযোগ্য নয়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে নানা কমিটি এদেশের জনসম্পদের সমীক্ষা করেছে এবং ১৯৯৯তে কেন্দ্রীয় জল মন্ত্রক (Ministry of Water Resource)-এর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ ১৯৫৩ ঘন কিমি। বাষ্পীভবন, বাষ্পমোচন, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ঝরে পড়া সব বৃষ্টির জল ব্যবহার করা যায় না। নীচের সারণীতে নানা কমিটির হিসেব করা জলের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

কমিটি	জলের পরিমাণ (ঘন কিমি)
১। প্রথম সেচ কমিশন (১৯০২-০৩)	১৪৪৩
২। এ. এন খোসলা কমিটি (১৯৪৯)	১৬৭৬
৩। কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন (১৯৫৪-১৯৬৬)	১৮৮১
৪। জাতীয় কৃষি কমিশন	১৮৫০
৫। কেন্দ্রীয় জল কমিশন (১৯৮৮)	১৮৮০
৬। কেন্দ্রীয় জল কমিশন (১৯৯৩)	১৮৬৯
৭। কেন্দ্রীয় জল মন্ত্রক (১৯৯৯)	১৯৫৩

ভারতে প্রাপ্য জলের পরিমাণ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতান্তর আছে। বিতর্কের কারণ হল বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের পরিমাণ। ভারত সরকারের জলসংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদনে মোট বৃষ্টিপাতের ৪০ শতাংশ বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ২০০৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি এন নরসিমহান একটি গবেষণাপত্রে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভারতের মাটিতে ঝরে পড়া জলের প্রায় ৭০ শতাংশ বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের মাধ্যমে বাতাসে ফিরে যায়। তাঁর মতে এত জল বাতাসে মিশে যায় বলেই আমাদের ব্যবহার যোগ্য জলের পরিমাণ অনেক কমে যায়। এপ্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত এদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্য থেকে যে জল বাতাসে ফিরে যায়, তার একটি বড় অংশ হল সেচের জল। পশ্চিমবঙ্গের সীমার মধ্যে যে জল বৃষ্টি থেকে পাওয়া যায় তার ২১ শতাংশ বাষ্পীভবন হয় বন্ধ্যা জমি থেকে আর ২৮ শতাংশ জল বাষ্পমোচন হয় কৃষিজমি থেকে। সুতরাং বাষ্পীভূত সব জলই আমাদের ব্যবহারের আগেই বাতাসে মিশে যায় এমন ধারণা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় জল মন্ত্রক মনে করে যে জল জলাধারে সংরক্ষিত হয়, নদী থেকে টেনে কৃষিজমিতে নিয়ে যাওয়া হয় সেই পরিমাণ জলই আমাদের ব্যবহার যোগ্য। এ পর্যন্ত ভারতে যত জলাধার তৈরী হয়েছে বা আরও যেগুলি প্রস্তাবিত বা নির্মীয়মান তাদের মোট জল ধারণ ক্ষমতা ৩৮৫ ঘন কিমি। সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে দেশের নানা প্রান্তে আরও জলাধার তৈরী করলে

সর্বোচ্চ ৬৯০ ঘন কিমি জল সংরক্ষণ করা যাবে আর মাটির নীচ থেকে পাওয়া যাবে ৪৩২ ঘন কিমি জল। কিন্তু এপ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন আমাদের কৃষিব্যবস্থা আজও মৌসুমী বায়ু নির্ভর। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বর্ষার সাথে সাথে শুরু হয় খারিফ চাষ। মৌসুমি বায়ুর ছন্দ বিঘ্নিত হলে বিপন্ন হয় আমাদের কৃষি অর্থনীতি। কৃষিজমিতে ঝরে পড়া বৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে আছে এদেশের কৃষিব্যবস্থা। এই জল বাঁধ দিয়ে সংরক্ষণ করা বা মাটির নীচ থেকে টেনে তোলা হয় না। এছাড়া, মাটির নীচ থেকে। মাত্রাতিরিক্ত শোষনে ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে মাটির নীচের জলস্তর। সম্প্রতি নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে আগষ্ট ২০০২ থেকে অক্টোবর ২০০৮ সালের মধ্যে রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লী অঞ্চলে ১০৯ ঘনকিমি জল মাটির নীচ থেকে টেনে তোলা হয়েছে। এই অবস্থা চলতে দিলে অদূর ভবিষ্যতে ওই এলাকার ১১.৪০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হবে- এমন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

ভারতের জলসম্পদ ঃ একনজরে (ঘন কিমি)

বৃষ্টিপাত	বাষ্পীভবন বাষ্পমোচন	প্রাপ্য জল			ব্যবহার্য জল			তথ্যসূত্র
		নদীর জল	ভৌমজল	মোট	ভূপৃষ্ঠের জল	ভৌমজল	মোট	
৪০০০	১৬১৫	১৯৫৩	৪৩২	২৩৮৫	৬৯০	৩৯৬	১০৮৬	ভারত সরকার (১৯৯৯)
৪০০০	১৬৯৯	১৮৬৯	৪৩২	২৩০১	৬৯০	৪৩২	১৩২২	গুপ্ত ও দেশপান্ডে (২০০৪) ও কেন্দ্রীয় জলমন্ত্রক (ডি.২০০৭)
৩৮৩৮	২৩৭০	১২৬০	২০০	১৪৬০	৪৩৮	২৭৪	৭১২	নরসিংমহন
৩৬৪৬	১৫৪৯	১৬৬৫	৪৩২	২০৯৭	৬৯০	৪৩২	১৩২২	এই নিবন্ধ

বন্যার জল ও পলি ব্যবহার করাও এদেশের কৃষিব্যবস্থার ভিত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নদীর দুই পাড়ে বাঁধ তৈরী আর স্বাধীনতা-উত্তরকালে বহু বড় বড় জলাধার নির্মানের পর কৃষিক্ষেত্রে বন্যার জল ও পলি ব্যবহারের চিরায়ত ধারাটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতে কৃষিজমির পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটি হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৪৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় জলমন্ত্রকের সর্বশেষ প্রতিবেদন (Report of the working group of water Resources for the XI Five year plan 2007-12) থেকে জানা যায় সারা দেশে এপর্যন্ত ১০.২৪ কোটি হেক্টর জমিতে সেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে জল পৌছায় ৮.৭২ কোটি হেক্টর জমিতে। সেচসেবিত জমির প্রায় ৬১ শতাংশ এলাকা ক্ষুদ্রসেচের আওতাভুক্ত - অর্থাৎ যেখানে জলের জোগান দেওয়া হয় জল সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। একদিকে যেমন চাহিদা বাড়ছে অপ্রতিহত গতিতে অন্যদিকে উষ্ণায়নের প্রভাবে টান পড়ছে যোগানেও। ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর চতুর্থ প্রতিবেদনে (২০০৭) বলা হয়েছে ১০°দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ যেখানে অবস্থিত, ১৯৭০ সালের পর থেকে বৃষ্টি কমছে, উষ্ণতা বাড়ছে, বদলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধরণ। অল্প সময়ের মধ্যে অতিবৃষ্টি তারপর দীর্ঘ সময় ধরে অনাবৃষ্টি প্রায়শই আমাদের কৃষি অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। বাড়ছে খরা ও বন্যার প্রকোপ। উত্তাপ বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে বাষ্পীভবন, কমে যাচ্ছে আমাদের ব্যবহার্য জলের পরিমাণ। ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের চাহিদার চিত্রটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতে জলের চাহিদা (ঘন কিমি)

ক্ষেত্র	জলের চাহিদা (ঘন কিমি)		
	২০১০	২০২৫	২০৫০
সেচ	৬৮৮	৯১০	১০৭২
পানীয় জল	৫৬	৭৩	১০২
শিল্প	১২	২৩	৬৩
শক্তি	০৫	১৫	১৩০
অন্যান্য	৫২	৭২	৮০
মোট	৮১৩	১০৯৩	১৪৪৭

সূত্র- কেন্দ্রীয় জল মন্ত্রক (ডিসেম্বর ২০০৬)

লক্ষণীয় ভারত সরকারের ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত জলের চাহিদা ও যোগানের সারণী দুটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ২০২৫ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে এদেশে জলের চাহিদা যোগানকে অতিক্রম করবে। আমাদের বাৎসরিক জলের চাহিদার ৮৫ শতাংশ জল সেচের জল, পানীয় জল ও শিল্পের চাহিদা যথাক্রমে ৭ ও ১.৪৮ শতাংশ। ১৯৬০-এর দশক থেকে দেশজ বীজ বদলে আনা হয়েছিল উচ্চফলনশীল বীজ যার জলের চাহিদা অনেক বেশি। পশ্চিমবাংলায় শুখা মরশুমে যে বোরো ধানের চাষ হয় তার জন্য জল লাগে প্রচুর - এক কিলোগ্রাম ধান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় ৪৮০০ লিটার জল। মাটির নীচ থেকে জল তুলে এই চাষ যে চিরকাল করা যাবে না তা নিয়ে মতান্তরের কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীনতা -উত্তর কালে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জলের চাহিদা আর কমেছে মাথাপিছু জলের বরাদ্দ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ২০৫১ সালে দেশের জনসংখ্যা ১৩৫ থেকে ১৫৮ কোটির মধ্যে কোন সংখ্যায় পৌছাবে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য প্রয়োজন হবে ৪২ কোটি টন খাদ্যশষ্য। সুতরাং চাই আরও অনেক সেচের জল- এমন কথাই বলছে ভারত সরকার।

কিন্তু যে কথা বলা হয়না তা হল কৃষিক্ষেত্রে জলের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, পাশাপাশি প্রয়োজন জল সংরক্ষণের চিরায়ত পদ্ধতিগুলির পুনর্জীবন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে অনেক আশা জাগিয়ে দেশজুড়ে নির্মিত হয়েছিল বহু জলাধার। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু স্বপ্ন দেখেছিলেন - বড় বাঁধগুলি হবে ভারতে উন্নতির দেবালয়। সেই দেবালয়ের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল প্রায় চার কোটি মানুষের বাস্তুভিটে। কিন্তু বড় বাঁধ সেচের প্রত্যাশা পূরণ করেনি। জলাধারে সংরক্ষিত জলের ৪০ শতাংশ মাত্র কৃষিজমিতে পৌছেছে - বাকী জল হয় বাষ্পীভূত হয়েছে বা খালের নীচের মাটি শুষে নিয়েছে। বড় বাঁধ নিয়ে নেহেরুর মোহভঙ্গ হয়েছিল অচিরেই। কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি দপ্তরের ২৯তম সভায় তিনি বলেছিলেন - আমি এক বৃহদায়তনের মোহে আক্রান্ত হয়েছিলাম, আমাদের ফিরতে হবে ছোট ছোট প্রকল্পে, তাতেই দেশের মঙ্গল। কিন্তু নেহেরুর সেই পরামর্শ কেউ মনে রাখেননি, নদীকে বন্দী করার পশ্চিমি কৃৎকৌশলের ধারা আজও অব্যাহত। এছাড়াও ঘোষিত হয়েছে দেশের সব নদীকে যুক্ত করার এক অতিউচ্চাশী প্রকল্প। জলসংরক্ষণের দেশজ ধারাটি আজও অবহেলিত যে ধারাটি ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ২০০১ সালে ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়নন বলেছিলেন - দেশজ জলসংরক্ষণের ধারাটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার অর্থ আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিরোধিতা করা নয় বরং আধুনিক বিজ্ঞান ও দেশজ জ্ঞানে সমন্বয় ঘটিয়ে জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। তাতেই মানুষের বৃহত্তর মঙ্গল।

তথ্য সূত্র ঃ

1) *T. N. Narasimhan (2008) : A note on Inidia's water budget and evapotranspiration- Journal of Earth System Science. vol. 117 No 3 pp. 237-240.*
2) *N. K. Gary and Q. Hassan (2007) : Alarming Scarcity of Water in India Current Science, Vol. 93 No. 7 pp. 932-941.*
3) *S. K. Gupta and R. D. Deshpande (2004) : Water for India in 2050 : first-order assessment of available options- Current Science. Vol. 86 No. 9 pp. 1216-1224.*
4) *Govt. of India (December, 2006) : Report of the Workign Group on Water Resources for the XI five year plan (2007-2012) Ministry of Water Resources. pp. 1-18.*
5) *Govt. of India (1999) : Report of the National Commission for Integrated Water Resources Development. Vol - 1. pp. 1-23.*
6) *WBPCB (2009) : Water Resource and its Quality in West Bengal. pp. 8-18.*
7) *A. Agarwal & S. Narain (2005) : Dying Wisdom, C.S.E. Delhi. pp. 25-312.*
8) *A. Agarwal & others (2001) : Making Water Everybody's Business, C.S.E Delhi. pp. 1-15.*
9) *IMD (2009) : Unpublished Records of Rainfall in India.*

শিশুর শিক্ষা অধিকার আইন, কি অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূর করবে?

রবীন মজুমদার

২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনীতে যুক্ত হয়েছে ২১এ ধারা। এতদ্বারা ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল ভারতীয় শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এবং বলা হয়েছিল যে উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

অনেক বিচার বিবেচনার শেষে প্রণীত হল - দি রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯ -সংক্ষেপে শিক্ষার অধিকার আইন।

এই আইনের প্রধান প্রধান সংস্থানগুলি এরকম ঃ-

- ৬-১৪ বছর বয়সীরা সকলেই শিশু। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার। সমস্ত সরকারী স্কুলে এলাকার (neighbourhood) শিশুদের ভর্তি করতে হবে এবং ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা দিতে হবে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক ভাবে।

  বেসরকারী স্কুলেও শতকরা ২৫ ভাগ আসনে এলাকার দুর্বল ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের ভর্তি করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দিতে হবে। কোনরকম টাকাপয়সা নেওয়া চলবে না।

  ভর্তি হতে শিশু বা তার অভিভাবকদের কোনরকম পরীক্ষা দিতে হবে না। কোন শ্রেণীতেই শিশুকে আটকে রাখা যাবে না। অষ্টম শ্রেণীর শেষে একবারই মাত্র বোর্ডের পরীক্ষা হবে এবং শিশুকে শিক্ষান্ত সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। শিক্ষার মাধ্যম যথাসম্ভব মাতৃভাষা হবে।
- সরকারী ও সরকার অনুমোদিত সব স্কুলে ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকবে। এই কমিটির তিন-চতুর্থাংশ সদস্য হবেন পাঠরত শিশুদের অভিভাবক। কমিটির অর্ধেকটাই হবেন মহিলা সদস্য।
- অননুমোদিত কোন বেসরকারী স্কুল থাকবে না। চালু বেসরকারী স্কুলে শর্তাদি পূরণ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আইন চালু হবার তিন বছরের মধ্যে অনুমোদন পেতে হবে। অনুমোদন নিয়ে নতুন বেসরকারী স্কুল হতে পারবে।
- প্রত্যেক স্কুলে উপযুক্ত সংখ্যক সঠিক মানের শিক্ষক থাকবে। শিক্ষকরা কেউ টিউশন করতে পারবেন না। স্কুলের বাড়ী, পানীয় জলের সংস্থান, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, মিড-ডে-মিল রান্নার ঘর, খেলার মাঠ ও লাইব্রেরী থাকবে।
- কেন্দ্রে গঠিত হবে জাতীয় পরামর্শদাতা পর্ষদ এবং রাজ্যে রাজ্যে গঠিত হবে রাজ্য পরামর্শদাতা পর্ষদ - কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে শিক্ষা অধিকার আইন রূপায়নে পরামর্শদানের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার একটি অভিন্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম কাঠামো (Framework of National Curriculum) তৈরী করবেন।
- শিশু অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০৫ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই গঠিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিশনগুলিও এই আইন রূপায়নের ব্যাপারে মতামত দিতে পারবেন এবং শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত তাঁরা করবেন।

আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় নাগরিকরা আশ্বস্ত বোধ করবেন যে, অবশেষে নিজ-নিজ এলাকার মধ্যেই শিশুরা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেদহীন শিক্ষালাভ করবে নিজ নিজ মাতৃভাষায়। দেশে নিরক্ষর কেউ থাকবে না। দলে দলে স্কুলছুট হয়ে নিরক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধি করবে না। কিন্তু বর্তমান আইনের মাধ্যমে এরকম কিছু ঘটে ওঠার আশা দুরাশা। কারণ ঃ

- প্রস্তাবিত স্কুলগুলি নামেই 'নেবারহুড' স্কুল। এলাকার সমস্ত শিশুকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এলাকার স্কুলেই বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি হতে হবে এমনটা মোটেই নয়। অনুমোদিত বেসরকারী স্কুলে বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ৭৫ শতাংশ শিশু এলাকার বাইরে থেকেও আসতে পারে। 'ভালো' স্কুলের খোঁজে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের শিশুরা কল্যানী থেকে কলকাতা পাড়ি দিতেই পারে।

- বেসরকারী স্কুলের ব্যবসা করার সুযোগ এবং উৎসাহ বজায় থাকছে। শতকরা ২৫ জন স্থানীয় দুর্বল ও অসুবিধাগ্রস্থ শিশুকে তারা ভর্তি করতে বাধ্য ঠিকই, কিন্তু খরচা বাবদ তারা ঐ শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা পাবে। ঐ শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে বাড়তি খরচের টাকা নিতেও আইনে বাধা নেই (১২ (২) ধারা)।

- ৬ বছর বয়সের আগে 'প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা' অবৈধ নয় -সেই শিক্ষা নিয়ে ব্যবসাও অবৈধ নয়। আইন শুধু বলেছে, যে কোন স্কুল যারা প্রাক স্কুল শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাদেরও পুরো বা আংশিক (২৫ শতাংশ) ভর্তির বিধি মানতে হবে (১২ (১সি)র ধারা)।

- পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে যে বহুসংখ্যক পরীক্ষামূলক এবং ভিন্নপথের স্কুল আছে, তাদের পক্ষে এই আইন মৃত্যু পরোয়ানার মত। অনুমোদন পাবার সর্তাদি (বাড়ি ঘর, জল, টয়লেট, শিক্ষক, খেলারমাঠ, লাইব্রেরী ইত্যাদি) পূরণ - তিন বছরের মধ্যে তাদের অধিকাংশই করতে পারবে না এবং অনুমোদনহীন হয়ে যাবে। অনুমোদন ছাড়া চালাতে গেলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা অনুমোদনহীন ভাবে চালানো প্রতি দিনের জন্য আরও দশহাজার টাকা করে জরিমানার ঝুঁকি নিতে না পেরে এরকম স্কুলগুলি উঠেই যাবে। আবেগ অনুভূতি আদর্শ সদিচ্ছা সম্বল করে স্কুল স্থাপন আর সম্ভব হবে না। প্রচুর লগ্নি করে পরিকাঠামো তৈরী করে অনুমোদন পেতে হবে। যা আছে শুধুমাত্র দেশী বিদেশী বাণিজ্যিক লগ্নীকারীদের।

- 'যথাসম্ভব' মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের অষ্টম তপসিলভুক্ত ২২টি ভাষাতেও এখনও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করা যায় নি। বাইরে যে আরও প্রায় ২০০ ভাষাভাষী শিশু - তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কি 'সম্ভব' হবে? ভাষার বাধা যে বহুসংখ্যক ভারতীয় শিশুর স্কুল শিক্ষার অন্তরায় তা দূর হবে কি?

- সবচেয়ে বড়ো কথা, 'শিক্ষা অধিকার আইন' নিরক্ষরতা বা ড্রপআউট শূন্যে নামিয়ে আনার পরিসংখ্যানগত কারচুপিকে আইনসিদ্ধ করে দিচ্ছে। শিশু বাধ্যতামূলকভাবে প্রথম শ্রেণীতে বা তার আগে (বা পরে) একবার স্কুলে ভর্তি হলে, তার নাম কাটা যাবে না চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত। কাজেই খাতায় কলমে কেউ নিরক্ষর থাকল না, ড্রপআউটও হল না।

- সরকার বা সরকারী আধিকারিকরা যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন না দিলে বা তুলে নিলে আদালতেও যাওয়া যাবে না। আধিকারিকরা আইনী নির্দেশ যথাযথ পালনের সৎপ্রচেষ্টা করেছিলেন এটুকু বলাই যথেষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় ১৭ টি গ্রামপ্রধান ব্লকের প্রাথমিক স্কুল ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের ১৭ শতাংশ পড়তে পারে না। ১৯ শতাংশ লিখতে পারে না, ২৬ শতাংশ সরল পাটিগণিত করতে পারে না (প্রতীচী ট্রাস্ট - দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০০৯)।

এই সমীক্ষাতেই আরও ধরা পড়েছে যে এই না-পারার দলে আদিবাসী এবং মুসলিম শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশী এবং আরো আশ্চর্যের ও পরিতাপের বিষয় -যারা শিখেছে, তারা অনেকেই শিখেছে প্রাইভেট টিউটরের কাছে, স্কুলে নয়। এসব প্রবণতা কি রোধ করতে পারবে শিক্ষা অধিকার আইন?

'এলাকা'র (nighbourhood) সংজ্ঞা দেবেন সরকার। প্রয়োজনে নতুন নতুন সরকারী স্কুল তৈরী করার কথা সরকারের। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে সরকারী স্কুল তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে দিল্লী, ইন্দোর ইত্যাদি জায়গায় অনেক সরকারী প্রাথমিক স্কুল উঠে গেছে। সম্প্রতি কর্নাটক সরকার ৫০০ সরকারী স্কুল তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নববর্ষের (২০১০) উপহার ঘোষণা করেছে। সরকারী স্কুলের

জমিজমা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স শপিংমল ইত্যাদি তৈরী করতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারী লগ্নীকারীদের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে শিশুর স্কুল পাবার কথা। কিন্তু এরাজ্যে এখনও সব জেলাতেই স্কুলবিহীন গ্রাম আছে। সব মিলিয়ে মোট ৯৬৯ টি। কলকাতা শহরেও কর্পোরেশন পরিচালিত বহু প্রাথমিক স্কুল উঠে যাবার মুখে। শিক্ষকের অভাব এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক পরিষেবা (পানীয় জল, টয়লেট) বা ঘরের অভাব পশ্চিমবঙ্গের বহুসংখ্যক সরকারী স্কুলে প্রকট। স্কুল তুলে দেবার প্রধান কারণ দেখানো হয় - যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর অভাবকে। অথচ অনেক বেসরকারী স্কুলে সাধ্যাতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপালেও অভিভাবকদের লম্বা লাইন। শিশুদের শিক্ষার গোড়াপত্তনে ন্যুনতম পরিকাঠামোর অতিরিক্ত আরও যেটুকু দরকার তার একান্ত অভাব প্রায় সমস্ত সরকারী স্কুলে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে শিক্ষা অধিকার আইন শিশুদের স্কুলগুলির মধ্যে বৈষম্য ও শ্রেণীবিভাজন রোধ না করে বাড়িয়েই দেবে। বস্তুত, এই আইন দেশের অনুসৃত যে উন্নয়ন পন্থা - বাজার বিশ্বায়নের চলতি পন্থা - তার পরিপূরক মাত্র। জাতীয় ঐক্য ও সমতার নামে একটি অভিন্ন পাঠক্রম কাঠামো কেন্দ্রীয়ভাবে স্থিরীকৃত হবে। এই কাঠামো যদি ন্যূনতম অর্জনের লক্ষ্যমাত্রায় সীমাবদ্ধ রেখে ভারতের ভাষা, জীবনযাত্রা, পরিবেশের বৈচিত্র্য অনুযায়ী পাঠ্যসূচি, পদ্ধতি উপকরণ ও প্রকরণ গ্রহণের স্বাধীনতা দিতে পারতো, তাহলে কিছু অগ্রগতি সম্ভব হতো। কিন্তু সেরকমটা হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। যদি এখনকার মতই প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম 'বৃহৎ ও উচ্চাভিলাষী' হয় 'অত্যাধিক বোঝা' হয় এবং প্রাথমিক স্তরে পাঠরত দুর্বল ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের শিশুরাও প্রাইভেট টিউশনকে 'অপরিহার্য' গণ্য করতে বাধ্য হয় এবং টানতে না পেরে ঝরে পড়ে, তাহলে? তাহলে কি হয় তা শ্রীযুক্ত অমর্ত্য সেনের কথাতেই শোনা যাকঃ "ভারতের মতো দেশে .....এটি ('কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট' প্রাইভেট টিউশনের অপরিহার্যতা) সকল শিশুর বুনিয়াদি শিক্ষার অধিকারকেই অবলুপ্ত করে" (প্রতীচী ট্রাস্ট, দ্বিতীয় রিপোর্ট - অমর্ত্য সেনের ভূমিকা)।

বর্তমানে ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও পন্থা দরিদ্র ভারবাসীকে বৃত্তের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে বা নিতে দিচ্ছে তাদের অধিকারে থাকা জমি ও জলের মত যৎসামান্য প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সংস্থান। প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার আইন তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত বলে শংসিত করে ছেড়ে দেবে, কিন্তু কার্যত কেড়ে নেবে তাদের নিজ জীবনে নিজ ভাষায় নিজ পরিবেশে নিজ-নিজ পরিজনের পরিচর্যায় শিক্ষা পাবার বুনিয়াদি অধিকার।

এরকমটাই যে হবে তা ভাবার অবকাশ থাকছে এই কারণে যে 'শিক্ষা' বলতে আমরা বরাবর বোঝাতে চেয়েছি খাঁচার শিক্ষাকে। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে, জীবনযাত্রার প্রক্রিয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিশুর মগজে 'শিক্ষা' পুরে দিতে চেয়েছি। এর নাম 'এডুকেশন'। এতে লাগে ঘর বাড়ী শিক্ষক বই এবং উপকরণ। ভুলে গেছি যে ইংরেজী লার্নিং (Learning) কেও বাংলায় এবং ভারতীয় সব ভাষায় আমরা 'শিক্ষা'-ই বলি, যদিও সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ এটা হতে পারে না। সম্প্রতি একটি নিবন্ধে শিক্ষাবিদ ইন্দ্রনাথ গুহ লার্নিং বোঝাতে গিয়ে বলেছেন লেখাপড়া/পড়াশোনা/বিদ্যার্জন/জ্ঞানার্জন। তাই যদি হয়, তবে লার্নিং বিশেষত শিশুদের লার্নিং জীবন থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। পরিবেশকেও জীবন থেকে বিযুক্ত করা যায় না। অথচ আমরা শিশুদের 'এডুকেশন' দিতে চেয়েছি, 'লার্নিং' থেকেছে উপেক্ষিত অপাংক্তেয়। শিশুদের কাছে যে এই 'শিক্ষা' আকর্ষনীয় হয় না, হবে না তাতে আশ্চর্য কি? শিক্ষা অধিকার আইন সব শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থাৎ প্রয়োজনে জরবদস্তি করেও, 'জাতীয়' প্রয়োজনের যুপকাষ্ঠে, 'এডুকেশন' দিতে চায়, শিশুর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য লার্নিং এর শিক্ষায় উত্তরণ ঘটাতে চায় না। শিক্ষার ঘরে শিশুকে গুঁজে দিতে চায়, শিশুর ঘরে শিক্ষা পৌঁছতে চায় না।

ভারতীয় শিশুজীবনকে বুঝতেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। তাঁরা যে শিক্ষার কথা বলতেন তাতে লার্নিং এর স্থান ছিল মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ তো জীবনে 'এডুকেশন' পাননি। এডুকেশন দেবার খাঁচাগুলিও তাঁর খুবই অপছন্দের ছিল। তাঁর মত 'অশিক্ষিত' মহামুর্খকে আমরা গুরুদেব বিশ্বকবি ইত্যাদি অভিধায় পূজো করতে পারি, কিন্তু তাঁর (এবং গান্ধীর) শিক্ষাভাবনাকে বাস্তব আধুনিক ও কার্যকরী করে নেবার উদ্ভাবনীশক্তি আমাদের নেই, অথবা আমরা সচেতন ভাবেই তাঁদের পরিহার করি। শিশুর শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ কে তাই, প্রচলিত হিন্দী প্রবাদকে একটু বদলে নিয়ে বলা যায় - ষাট সাল বাদে বলদের বাচ্চা হল, তাও মৃত।

পারমানবিক শক্তি উৎপাদনের প্রতিটি ফাঁক ও ফোকড় থেকে উঠে আসে মারণ বর্জ্য

পাচু রায়

বিখ্যাত মার্কিণ লেখক পিটার কাস্টার্স ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-মার্কিণ পরমানু চুক্তির সমূহ বিপদ সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন, 'শুধুমাত্র শক্তি উৎপাদনের নিখাদ নিরিখে যদি দেখা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই পারমানবিক শক্তি উৎপাদনকে মানবসভ্যতার কল্যানকামী বলা যায়।' কিন্তু এরপর তিনি বলেছেন, '...চুল্লীতে পারমানবিক জ্বালানীদন্ড প্রবিষ্ট হওয়ার পর থেকে যা ঘটে তার বিষময় পরিণাম যেন সর্বত্রগামী।' (সূত্র, নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'মান্থলী রিভিয়ু' সেপ্টেম্বর, ২০০৯) পারমানবিক বর্জ্য উৎসারনের তিনটি ধাপ নিয়ে ঐ নিবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। 'প্রথমত খনি থেকে ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও ঝাড়াই বাছাই পর্ব, দ্বিতীয় ধাপ, অবচয়িত জ্বালানী দন্ড যা নিজেই একটি পারমানবিক বর্জ্য এবং তৃতীয়ত, আগের পারমানবিক জ্বালানী দন্ডের পুণঃপ্রক্রিয়ার সময় প্রবল পরিমানে উৎসারিত পারমানবিক বর্জ্য।'

এখন পর্যন্ত ৩১টি দেশ পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যাদের নামের তালিকার সঙ্গে বন্ধনীতে মেগাওয়াটে সেই দেশের বাৎসরিক পারমানবিক বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ও সেটা দেশের বিদ্যুতের মোট চাহিদার কত শতাংশ তার উল্লেখ থাকছে (সূত্রঃ WORLD NUCLEAR ASSOCIATION - বা WNA , লন্ডন UK, SWIY4JH)। আর্জেন্টিনা (৯৩৫, ৬.৯ শতাংশ), আর্মেনিয়া (৩৭৬, ৪২ শতাংশ), বেলজিয়াম (৫৭২৮, ৫৪ শতাংশ), ব্রাজিল (১৯০১, ৩.৩ শতাংশ), বুলগারিয়া (১৯০৬,৪৪ শতাংশ), কানাডা (১২৫৯৫, ৬ শতাংশ), চীন (৮৫৮৭, ১.৯ শতাংশ), তাইওয়ান (৪৮৮৪, ২০ শতাংশ), চেক রিপাবলিক (৩৪৭২, ৩১ শতাংশ), ফিনল্যান্ড (২৬৯৬, ২৮ শতাংশ), ফ্রান্স (৬৩৪৭৩, ৭৮ শতাংশ), জার্মানী (২০৩৩৯, ৩২ শতাংশ) হাঙ্গেরী (১৮২৬, ৩৮ শতাংশ), ভারত (৩৭৭৯, ২.৬ শতাংশ), জাপান (৪৭৫৭৭, ৩০ শতাংশ), লিথুয়ানিয়া (১১৮৫, ৬৯ শতাংশ), মেক্সিকো (১৩১০, ৪.৯ শতাংশ), নেদারল্যান্ডস্ (৪৮৫, ৩.৫ শতাংশ), পাকিস্তান (৪০০, ২.৯ শতাংশ), রাশিয়া (২১৭৪৩, ৬ শতাংশ), শ্লোভাকিয়া (২০৬৪, ৫৭ শতাংশ), শ্লোভেনিয়া ৬৯৬, ৪০ শতাংশ), দক্ষিন আফ্রিকা (১৮৪২, ৪.৪ শতাংশ), স্পেন (৭৪৪২, ২০ শতাংশ), সুইডেন (৯০৮৬, ৪৮ শতাংশ) , সুইট্সারল্যান্ড (৩২২০, ৩৭ শতাংশ), ইউক্রেইন (১৩১৬৮, ১৮ শতাংশ) , দক্ষিন কোরিয়া (১৭৫৩৩, ৩৯ শতাংশ) এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (৯৯০৪৯, ১৯ শতাংশ)। অর্থাৎ ঐ ৩১ টি দেশের মধ্যে কেবলমাত্র ফ্রান্স, শ্লোভাকিয়া এবং বেলজিয়াম - এই তিনটি মাত্র দেশে মোট চাহিদার ৫০% বা তার বেশি উৎপাদিত হচ্ছে। প্রত্যাশার ফানুশের এর চেয়ে আর কত শোচনীয় পরিনতি হতে পারে!

পরমানু বিদ্যুৎ নিয়ে মিথ্যা ঢাক বাজাবার ধাপ্পাটির থেকেও বড় কথাটি হল বর্জজাত সমস্যা যা পিটার কাস্টর্সের কথায় - 'পরমানবিকশক্তি উৎপাদন শৃঙ্খলের প্রথম ধাপটি হল, খনি থেকে ইউরেনিয়াম উত্তোলন। ভারতেও ঘটে এই উত্তোলন পর্বটি, যা ভারত-মার্কিণ পরমানু সম্পর্কের ফলে আরও তীব্রতা লাভ করবে। আকরিক ইউরেনিয়াম উত্তোলনের পর তাকে পারমানবিক জ্বালানীর জন্য কাঁচামাল হিসাবে তৈরী করতে হয়। ঝাড়ামোছার পর এই প্রক্রিয়ায় তাই পড়ে থাকে তেজস্ক্রিয় সামগ্রী সমন্বিত বিশাল পরিমান ক্ষতিকারক অবশেষ। তেজস্ক্রিয়তার কারণে এই অবশেষ মানুষ ও প্রকৃতির পক্ষে বিপজ্জনক। আয়তনের নিরিখে, পারমানবিকশক্তি উৎপাদনশৃঙ্খলে যত বর্জ্য উৎসারিত হয় তার ৯৫% ভাগই ঘটে এই ঝাড়াই বাছাই পর্বে। এই অবশেষে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পড়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রেডিয়াম ২২৬ এবং ৭৬ হাজার বছর অর্ধ আয়ুর (half life) থোরিয়াম ২৩০, যার অর্ধেক তেজস্ক্রিয়তা বিনষ্ট হতে ৭৬ হাজার বছর কেটে যায়। ইউরেনিয়াম আকরিক খনি থেকে তোলা ও

ঝাড়াই বাছাই করার ভিতর দিয়ে পুঁজিবাদী সংগঠকরা শুধু যে আমাদের ছেলেপুলে এবং নাতি-নাতনিদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে তাই নয়, অনন্তকাল প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে চলবে এই বিষের বোঝা। আকরিক উত্তোলন পর্বের এই সর্বনাশা পরিনামের কথা লিপিবদ্ধ আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে সূত্রপাত ঘটে পারমানবিকশক্তি উৎপাদনের। ঝাড়াইবাছাইয়ের পর অবশিষ্ট গুঁড়োগুলো যে বাঁধে জমিয়ে রাখা হত সেখানে বৃষ্টির জল পড়ে তৈরী হত বিষাক্ত কাদা। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এইরকম ১৫টি বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। রিওপুরকো একবার ভেসে গিয়েছিল ৯৪০ লক্ষ গ্যালন ঐ বিষাক্ত কাদায়। ফলে দূষিত হয়ে গিয়েছিল নদীর জলও।'

শুরুতেই উল্লিখিত, চুল্লীতে পারমানবিক জ্বালানীদন্ড ঢোকাবার পর থেকে যা ঘটে তার বিষময় পরিণাম সর্বত্রগামী। পারমানবিক জ্বালানীদন্ড থাকে তিন বছর। তাই নিয়মিত দন্ডগুলি পাল্টাতে হয়। বাতিল জ্বালানীদন্ড অর্থনীতির সূত্রানুযায়ী, উৎপাদনের অবচয়িত উপকরণ, যা তার পুরোনো মূল্য হারিয়ে পারমানবিকশক্তি নামক নতুন পণ্য-মূল্যে স্থানান্তরিত। কিন্তু দন্ডগুলি নিঃসন্দেহে অতি বিপজ্জনক বর্জ্য। পরিমানগত বিচারে এই বর্জ্য খুব বড় আকারের না হলেও, তেজস্ক্রিয়তার নিরিখে বিপুল। এই বর্জ্যে যে সব তেজস্ক্রিয় মৌল থাকে তা হল, স্ট্রন্সিয়াম ৯০, সিসিয়াম ১৩৭ এবং প্লুটোনিয়াম। এর মধ্যে বিশ্বের নিকৃষ্টতম বিষ প্লুটোনিয়াম 'ম্যানমেড', কারণ প্রকৃতিতে প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায় না। প্লুটোনিয়াম ২৩৯ এর হাফ লাইফ ২৪ হাজার বছর এবং প্লুটোনিয়াম ২৪২ এর ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বছর, যার মাইক্রোগ্রাম (১ গ্রামের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ) পরিমান নিশ্বাসে মিশলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা 'উজ্জ্বল'। সুতরাং বাড়তি প্রতিটি চুল্লী তৈরী করবে উচ্চপর্যায়ের নানান পারমানবিক বর্জ্যে সম্পৃক্ত নিঃশেষিত জ্বালানীদন্ড।

কয়েকদশক ধরে পশ্চিমের নীতি নির্দ্ধারকরা আমজনতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, তারা নিঃশেষিত জ্বালানীদন্ডের সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলেছেন। তারা বোঝাচ্ছেন, ঐ জ্বালানী দন্ডগুলিতে রাসায়নিক প্রয়োগে ইউরেনিয়াম পুনর্ব্যবহার করে তৈরী করা প্লুটোনিয়াম দিয়ে নতুন জ্বালানী উৎপাদিত হতে পারে। যদিও এখানেই আসলে তৈরী হচ্ছে সমস্যার পাহাড়। এই পর্বেই উৎসারিত হচ্ছে উচ্চপর্যায়ের নির্দিষ্ট শ্রেণীর বর্জ্য। কেননা রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ শুধু যে ইউরেনিয়ামকে প্লুটোনিয়াম থেকে পৃথক করে তাই নয়, বিপুল পরিমান বর্জ্য সৃষ্টি করে, যাকে আলাদা করে রাখা ছাড়া গতি নেই। এই পর্বে উৎসারিত হয় - ইউরেনিয়াম ২৩৬ যা ইউরেনিয়াম ২৩৫ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যার হাফ লাইফ ২.৪২ কোটি বছর। ভাবতে পারেন? সেই সঙ্গে জোডিয়াম ১২৯ থাকে এই বর্জ্যে, যার হাফলাইফ ১.৫৭ কোটি বছর। এই বিপুল সময়সীমাকে আমাদের চিন্তনে ঠাঁই দেওয়া মুশকিল, কিন্তু বোঝা যায় পারমানবিকশক্তি উৎপাদনের ফল কতটা বিপজ্জনক।

এখন ভারতবর্ষের নানান দলের রাষ্ট্রনায়করা যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে মনে হতেই পারে দু'এক বছরের মধ্যেই 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'র মতন আমাদের দেশ উপচে পরবে পারমানবিক বিদ্যুতে। কিন্তু তারা কি জানেন, ইনটারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন (IAEA)-এর মতন পরমানু ব্যবস্থাপনার সংগঠন (যার কাছে বিশ্বের সব দেশকে পরমানু চুল্লি বসাবার আগে অনুমোদন নিতে হয়) ১৯৭২ সালে ঘোষনা করেছিল, ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট পারমানবিক বিদ্যুতের পরিমান হবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মেগাওয়াট! ২০০৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত বিশ্বে মোট পারমানবিক বিদ্যুৎ ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ২ মেগাওয়াট অর্থাৎ লজ্জাজনক ভাবে লক্ষ্য মাত্রার ১.০৬% ভাগ এবং বর্তমানে গোটা বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১৬% ভাগ মাত্র (সূত্র -WNA)। ভারতবর্ষে ১৯৫৬ সালে প্রথম পারমানবিক চুল্লি 'অপ্সরা' যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছিল ১৯৮০ সালের মধ্যে ৮০০০ মেগাওয়াট পারমানবিক বিদ্যুৎ। ১৯৮০ সালে ভারতে মোট উৎপাদিত পারমানবিক বিদ্যুতের পরিমান ছিল ৬০০ মেগাওয়াট। আর ২০০৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত ৩৭৭৯ মেগাওয়াট। কিন্তু মনমোহন বাবু মুখে ইতিমধ্যেই ২০২০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 'উৎপন্ন' করে ফেলেছেন।

শতাংশ বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রায় একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন ২০০৯ সালে মার্কিন সরকার সামরিক খাতে ব্যয় ধার্য্য করেছে আনুমানিক ১১৪০ বিলিয়ন ডলার যার এক বড় অংশ ব্যবহৃত হয়েছে সন্ত্রাস মোকাবিলার প্রস্তুতিতে। SIPRI (২০০৯) হিসেব মতে ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যায় হয়েছে ১৪৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৪৫% বেশী।

সামরিক সরঞ্জামের বিশ্ববাজারে একচ্ছত্র অধিপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাজারের সিংহ ভাগ (৪১.৬%) তাদের দখলে। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার বাজারেও অন্যদেশে মার্কিন অস্ত্রের বিক্রী বেড়েছে ৫০%, উন্নয়নশীল দেশে সে বৃদ্ধির হার ছিল ৭০.১%।

(২) সংক্রমণ বিরোধী বিশ্ব প্রতিরোধ

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এক মূল সংক্রামক রোগের খবর ছড়িয়ে পড়ল। AIDS - acquired immunodeficiency syndrome। এটা অবশ্য রোগ নয়, নাম থেকেই পরিষ্কার, রোগের লক্ষন - যার মূল কারণ human immunodeficiency virus (HIV) সংক্রমণ। ২০০৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যাণে জানা যায় - পৃথিবীতে এরোগে মোট মৃত্যুর সংখ্যা আনুমানিক ২১ লক্ষ। সম্প্রতি ওবামা সাহেব বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে মার্কিন সরকার এডস, পোলিও, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ৬৩ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছেন। H_1N_1 প্রতিষেধক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে WHO আয়োজিত বিশাল কর্মযজ্ঞে অন্যান্য দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামিল। Ford, Bill Gates Foundation-এর মত সংস্থা ঢালাও অনুদান দিচ্ছে মারণ ভাইরাস সম্বন্ধে জনগনকে ওয়াকিবহাল করতে।

তবে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের আরও বড় সমস্যা হচ্ছে নিউমোনিয়া। ভারতে প্রতি মিনিটে একটি শিশু মারা যায় নিউমোনিয়ায়। বিখ্যাত Lancet (september 2009) পত্রিকার হিসেব মতে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় কুড়ি লক্ষ শিশু প্রতিবছর মারা যায় নিউমোনিয়ায় যা এড্স , হাম ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে মৃত্যুর চেয়ে বেশী। ভারতের মত আফগানিস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নিউমোনিয়ায় শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশী।

তাহলে এডস্, H_1N_1, এভিয়ান ফ্লু ইত্যাদি নিয়ে এত হৈ চৈ কেন ? কারণটা অর্থনৈতিক। নিউমোনিয়া সংক্রমণ, রোগ নয়। উন্নয়নশীল দেশের গরীব মানুষ বিশেষত শিশুরা এর শিকার। গরীবের ঔষধ কেনার সামর্থ্য নেই। 'নূন আনতে পানতা ফুরায়' অবস্থা। তাই নিউমোনিয়া নিয়ে বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানীর তেমন মাথা ব্যথা নেই। তার চেয়ে অনেক বেশী মুনাফার সম্ভাবনা থাকে যদি সংক্রামক কোন রোগের আশংকা থাকে - যার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক সামগ্রীর এক বিশ্ব বাজার তৈরী করা যায়। তাই HIV থেকে H_1N_1, Polio থেকে Jaundice B প্রতিরোধে চলছে বিশাল কর্মকাণ্ড। যত টাকা 'বুলাদি' বিজ্ঞাপনে খরচ হয়েছে সে টাকায় শুধু HIV আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ হাসপাতাল তৈরী করা যেত। অনেক HIV আক্রান্ত রোগীকে সমাজচ্যুত বাস্তুচ্যুত করা হয়, এমনকি বহু হাসপাতালও তাদের ফিরিয়ে দেয়। এমন বহু ঘটনাই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। সব জেনেও আমরা সঠিক চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা না করে, কন্ডোম, ডিসপসেবল সিরিঞ্জ, রক্তপরীক্ষার বিশেষ সরঞ্জামের এক বিশাল ব্যাপার তৈরী করেছি সংক্রমণের আতংকে ভুগে। আর HIV আক্রান্ত রোগীরা, যারা বেশীর ভাগই দুস্থ খেটে খাওয়া মানুষ, বিনা চিকিৎসায়, অপুষ্টিতে, ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে প্রতিদিন। আফ্রিকা সহ দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার এডস্ রোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের এক বৃহৎ অংশ দারিদ্রজনিত কারনে এমনিতেই শারিরীকভাবে দুর্ব্বল। এদের শরীরে HIV বাসা বাধবে - এটাই তো স্বাভাবিক।

(৩) ভূ-উষ্ণায়ন রোধে বিশ্বব্যাপী সমন্বয়

ভূ-উষ্ণায়ন এখন ধর্মতত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। গত শতকের শেষ দশকে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা যে বিতর্কের সূচনা করেছিলেন, পরবর্তী দশকে বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার কর্তারা বৈজ্ঞানিকদের হটিয়ে ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের ধারক ও বাহক রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। উষ্ণায়নের কারন, পরিমান, তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তি ও প্রতিকারের উপায় বাতলে দিচ্ছেন তারা। সব মিলিয়ে এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। ভিন্ন সুরের কোন স্থান নেই এ বিতর্কে। ভিন্ন মত শোনাও এখন পাপ।

আশ্চর্য্য হলেও সত্যি যে গত শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা শৈল যুগ প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলতেন। গবেষণা পত্রিকা ছাড়াও শৈলযুগের কথা বহুল প্রচারিত সাময়িক পত্রিকা গুলো ফলাও করে ছেপেছে বহুবার। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক! 'Another Ice Age?" (Time 1972), 'The cooling world' (News Week 1975), 'Scientists Ask : why world climate is changing: Major cooling May be ahead' (The New York Times 1975)। বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চই কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের মতামত জানিয়েছিলেন। গত আশির দশকের শেষ ভাগে বিশেষ করে ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পরমানু দুর্ঘটনার পর, ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশবিদদের আলোচনায় প্রাধান্য পায়। ১৯৮৭ সালে নরওয়ের প্রধান মন্ত্রি Gro Harlem Brundtland নামাঙ্কিত Brundtland Report (Our Common Future) প্রকাশ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের World Commission on Environment and Development (WCED) নামক সংস্থা। সেই দলিলে দাবী করা হয় যে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ড্রাই-অক্সাইডের মাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে আনুমানিক ৪.৫° সেন্ট্রিগ্রেড। প্রথমদিকে বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তরে নানা সমস্যা সম্বন্ধে আমরা অবগত হই। এর সমাধান কল্পে ১৯৮৭ সালে রচিত হয় 'মন্ট্রিল প্রটোকল' যা ১৯৮১ সালে কার্যকরী হয়। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৮৮ সালে একটি নূতন সংস্থা Intergovernmental Panel for climate change (IPCC) গঠন করে। IPCC গঠনে মার্কিনি ভূমিকা ছিল মুখ্য এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূ-উষ্ণায়ন মনুষ্য সৃষ্ট না প্রাকৃতিক কারণে সেটা বোঝা। খনিজ তেলের কারবারি মার্কিনিদের (ডলারের মূল্য নির্ধারিত হয় খনিজ তেলের বাজার দরের মাধ্যমে, খনিজ তেলের দাম বাড়লে ডলারের মূল্য বাড়ে - বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিনিদের প্রাধান্য বাড়ে। মনে রাখতে হবে ১৯৭৩ সালে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চালে মার্কিনিরা 'ডলার' কে 'Gold Standard' থেকে মুক্ত করে 'Oil Standard' এর সাথে জুড়ে দিয়েছে, তেলের যাবতীয় লেন দেন শুধু ডলারে করার অঙ্গীকার সৌদি আরব নিয়ন্ত্রিত OPEC থেকে আদায় করে) দরকার ছিল ভূ-উষ্ণায়নের কারণ হিসেবে কার্বনকে মুক্ত করা। তাই IPCC র সংজ্ঞায় 'climate change refers to any change in climate overtime, whether due to natural variability or as a result of human activity'. IPCC ১৯৯০ সালে তাদের 1st Assessment Report প্রকাশ করল। বলা হল প্রতি দশকে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়বে গড়ে ০.২২৫° সেন্টিগ্রেড। খেয়াল করুন তিন বছর আগে ১৯৮৭ সালে Brundtland Report কিন্তু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তাপমাত্রা ৪.৫° সেন্টিগ্রেড বাড়ার কথা বলেছিল। কোনটা বৈজ্ঞানিক তথ্য-নির্ভর? দুটো দলিলেই তো রাষ্ট্রপুঞ্জের শীলমোহর!

এদিকে ৯০ দশকে ইউরোপীয় গোষ্ঠী বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিনীদের হটিয়ে তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার আশায় কোমর বাঁধে। ভূ-উষ্ণায়ন জনিত আবহাওয়া সংকটকে সুযোগে পরিণত করতে চায়। তারা জানে মার্কিনি ডলারের মূল ভিত্তি খনিজ তেল। খনিজ তেলের চাহিদা যত বাড়ে - ডলারের মূল্য তত বাড়ে। আর এই শক্তিমান ডলারের মাধ্যমে মার্কিনিরা পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বস্তু (খনিজ তেল সহ) আমদানি করে নিজেদের ইচ্ছে মত। ডলারের আধিপত্য খর্ব করার একমাত্র উপায় খনিজতেলের চাহিদা কমানো এবং ডলারের বিকল্প এক সর্বগ্রাহ্য বিনিময় মুদ্রা প্রচলন করা। ১৯৯২ সালে রিও -তে বসুন্ধরা সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিল ইউরোপ ও জাপান। সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের আওতায় আরও একটি সংগঠন তৈরী করা হোল UNFCCC (United Nations Frame Work Convention for Climate Change) নামে। ১৯৯৪ সালে UNFCCC কার্যভার গ্রহন করে এবং এরপর প্রতিবছর UNFCCC রাষ্ট্রপুঞ্জের দেশসমূহের নটা সম্মেলন করে যার নাম conference of parties (COP)। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সম্মেলন (COPS)। হালে কোপেনহেগেনে শেষ হোল COP - পঞ্চদশ সম্মেলন। প্রশ্ন উঠতেই পারে IPCC তো ছিলই তবে UNFCCC কেন? উত্তরটা রাজনৈতিক (এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক)। UNFCCC র সংজ্ঞায় 'Climate change refers to a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the golbal atmosphere and that is in addition to natu-

ral climate variability observed over comparable time period'। লক্ষ করুন ভূ-উষ্ণায়ন বিতর্কে সরাসরি রাজনীতি ঢুকে পড়ল IPCC যেখানে 'natural variability-র কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করছে সেখানে UNFCCC প্রাধান্য দিয়েছে 'human activity' কে। ভূ-উষ্ণায়নের সাথে মনুষ্য সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস সরাসরি যেন সম্পর্কিত হয়ে উঠছে স্রেফ সংজ্ঞার পরিবর্তনের মাধ্যমে। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে যাচ্ছে। তৈরী হচ্ছে এক বিশাল কার্বন বাজার (Carbor Market)

১৯৯৭ সালে (COP 3) জাপানের কিয়োটা শহরে সম্পাদিত হয় Kyoto Protocol। মূল উদ্যোক্তা ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও জাপান। ক্লিন্ট ন সরকারও এতে স্বাক্ষর করে। রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় এলে সে চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে কিয়োটো সমঝোতার সাথে তাল রেখেই যেন ১৯৯৯ সালে ইউরোপীয় গোষ্ঠী ইউরো (Euro) প্রবর্ত্তন করে। ২০০৫ সালে দীর্ঘ টালবাহানার পর কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়িত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই উদ্যোগে সামিল না হলেও ভূ-উষ্ণায়নের হেতু আবহাওয়া পরিবর্তনের জেরে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে উঠে পড়ে লাগে। কোপেন হেগেন সম্মেলনে তারাই শেষ কথা বলেছে এবং বায়ুদূষণ রোধে কোন অবশ্যগ্রাহ্য (binding) অঙ্গীকার না করেও কার্বন বাণিজ্যের বাজার আরও বাড়িয়ে তুলেছে ভারত, চীন, ব্রাজিলের মত দেশকে সাথী করে।

পরিচ্ছন্ন উন্নয়ণ প্রক্রিয়া (Clean Development Mechanism) এর কল্যাণে সবুজ প্রযুক্তির এক বিশাল বাজার তৈরী হয়েছে। উন্নত দেশের দূষণকারী ভারী শিল্প যেমন পেট্রো কেমিক্যালস ইত্যাদি চীন ভারত বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হয়েছে বা স্থানান্তরনের প্রক্রিয়া চলছে। দূষণের বিষে দিন দিন নীল হয়ে উঠছি আমরা। সবুজায়নের নামে এবার 'সবুজ' প্রযুক্তি আমদানি করব আমরা। পরমানু বিদ্যুৎও 'সবুজ' প্রযুক্তি বলে চালানোর ও CDM এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চলছে বহুদিন থেকেই। কোপেনহেগেনেও জোর তদ্বির হয়েছে। পরমাণু বিদ্যুতের কারবারিরা এখনও সফল হয়নি। মার্কিনি চাপে এবার হয়ত হবে। মার্কিনিরা ভূ-উষ্ণায়নের বাজার ধরতে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা 'সবুজ' পরমাণু শক্তির বাজার তৈরী করছে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে। সাথে বলছে আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে চীন ও ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যাভাবে মারা পড়বে। তাই জিনগত পরিবর্তন ঘটানো (genetically modified) বীজ ও নূতন কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। এবার চাই দ্বিতীয় কৃষি বিপ্লব। রকফেলার, বিল গেটস ও মনসান্টো ফাউন্ডেশন ও মার্কিন সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হয়েছে এই নয়া উদ্যোগ। চিন ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে GM বীজ। বদলে যাচ্ছে কৃষি পদ্ধতি। ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য ও বীজের উপর কৃষকের মৌলিক অধিকার। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য হয়ে উঠছে রাসায়নিক বিষে নীল। আর ফুলে ফেঁপে উঠছে মনসানন্টোর মত বহুজাতিক সংস্থারা।

সন্ত্রাস, সংক্রমণ ও ভূ-উষ্ণায়ন রোধে আমরা সবাই যখন দারুন ব্যস্ত-সেমিনারে, কর্মশালায় এবং বহুজাতিক কোম্পানীর বোর্ড (Board) রুমে, তখন সবার অলক্ষ্যে প্রতি ছয় সেকেন্ডে পৃথিবীর কোন প্রান্তে একটি শিশুর মৃত্যু হচ্ছে অনাহারে, অপুষ্টিতে। আজও প্রতিদিন পৃথিবীর ১০২ কোটি মানুষ ঘুমোতে যায় আধপেটা খেয়ে। না.- খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি নেই। ক্রমবর্ধমান বেকারী ও খাদ্যশস্যের চড়া দাম গরীব মানুষকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রোজ। বাজার অর্থব্যবস্থার নামে এর ভয়ঙ্কর সর্ব্বগ্রাসী খেলায় মেতে উঠেছি আমরা।

লেখকের ই-মেল ঃ dip_dey@hotmail.com

তথ্য সূত্র ঃ

- *Dey, Dipankar, The second Green Revolution in India : The Emerging Contradictions, Consequences and the Need for an Alternative Initiative (August 12, 2009). Available at SSRN : http://ssrn.com/abstract=1447795*
- *Fact sheet, June 7, 2007, Office of Public Affairs, department of Defense, USA.*
- *Martin Khor & Sangeeta, 'Sharing' of avian flu virus a central issue at WHA Third World Resurgence, #201, May 2007*
- *Dey, Dipankar, The Political 'Economy of Apprehensions' and the Nobel Peace Prize to Obama (November 13, 2009). Available at SSRN : http://ssrn.com/abstract=1505374*

'অম্বর করিছে অশ্রুবরিষণ'

শঙ্কর রায়

নভোমন্ডলের অসীম পরিসরে মুনাফা-গৃধ্নুরা যখন দাপাদাপি শুরু করে নক্ষত্র যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্বে এবং আরো অনেক ভর্যাত-তীব্রতায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের জমানায়, জীবনানন্দ দাসের 'শকুন' কবিতাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে আসত। কেমন যেন এক প্রকার অসহায়তার কাছে পরাভূত মনে হ'ত, কারণ অধুনা-লুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নও সেই শঙ্কা-জাগানো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদে পা আটকে গিয়েছিল বলা যায়। তাই কবিতাটির কয়েকি পঙক্তি বার বার পড়তাম। জীবনানন্দ কি মনোজগতে বা কবি-কল্পনায় কোথাও কিছু আশংকার প্রতিভাস পেয়েছিলেন?

"সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাত ঘাঁটি বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিকহস্তিগণ
পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের পর"।

আজ তো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে পাল্লা দেবার কেউ নেই, চীন তো নয়ই। তবু আকাশে হানাদারি কমেনি। আকাশ দাপিয়ে শকুনদের আধিপত্য-প্রয়াস আজ হয়ত অন্তর্হিত, অন্তত দক্ষিণ এশিয়ায়-বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানে। বিশ বছর আগেও ভারতে ১০ লক্ষাধিক শকুন ছিল (যেগুলি প্রাচ্য প্রজাতির, অধিকাংশ গ্রিফন প্রজাতি-ভুক্ত।) কিন্তু আজ ১০০০টিও নেই ভারত ও পাকিস্তানে। কারণটা জানা - চীন থেকে শস্তা দামের পশু-ভেষজ ডিক্লোফেনাক আমদানী। গরু-মহিষ-এর মৃতদেহে এই বিষাক্ত ভেষজ থেকে যায় আর সেই মৃতদেহ-ভক্ষণ করা শকুনদের পক্ষে মারণ গরল। ভারত সরকার যখন ওই পশু-ভেষজ আমদানি নিষিদ্ধ করেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বামপন্থী দলগুলি (নক্সালপন্থী সহ) বা বড় বড় জনবিজ্ঞান সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে নীরব। নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় এ নিয়ে ডেবোরা ম্যাকেঞ্জির একটি ফিচার প্রকাশিত হয় ২০০৮-এর ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় (http://www.newscientist.com/article/dn13804-indian-vultures-circling-towards-extinction.html#)। শকুনের বহুগুণ লোলুপ দৃষ্টি হানাদারি জারি আছে। নক্ষত্র-যুদ্ধের প্রথম পর্যায় থেকে (সূত্রপাত ১৯৭০ দশকের শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রপতি লিওনিদ ব্রেঝনেভের জমানায়) আরো অনেক বিপজ্জনকভাবে দুনিয়ার ক্রম-বিস্তীর্ণ পরিসরে। কিন্তু তার ভয়াবহ *ব্যাপৃতি* ঘটে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের আমলে। তাঁর কুখ্যাত স্ট্র্যাডেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ (SDI)-এর আড়ালে। রেগানের খোলাখুলি যুদ্ধবাজ মানসিকতা স্ফুট হ'ল তাঁর ১৯৮৩ সালের ২৩ শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশন বক্তৃতায়, যাতে SDI প্রতিরক্ষা-অভিভাবনা বিবৃত হয়েছিল। মহাকাশে সামরিক প্রতিরক্ষা-প্রক্রিয়ার সাধারণের বোধগম্য পরিকল্পনার খসড়া সেই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল। ট্রুম্যান আমলের যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেসের ব্যর্থ স্বপ্ন রেগানের ভাষায় যেন নতুন ভাবে চাগিয়ে উঠেছিল। অনেকের মনে আছে, নেহেরু-নাসের-টিটো যখন ন্যাটো-সিয়াটো-সেন্টো বা ওয়ারশ কোন সামরিক জোটেই না গিয়ে জোট-নিরপেক্ষ বিদেশ-নীতি সূত্রায়িত ও ঘোষণা করলেন, প্রায় উন্মত্ত সারমেয়ের মত ক্ষিপ্ত হয়ে, কূটনৈতিক শিষ্টতা জলাঞ্জলি দিয়ে ডালেস ঐ নীতিকে immoral বলেছিলেন।

মহাকাশে যুদ্ধবাজ-হানাদারি যে কি ভয়ঙ্কর এবং অনুন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলির বিরুদ্ধে কিরকম চক্রান্তমুখী তার একটি উদাহরণ ১৯৮০ দশকের জেনিথ স্টার প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর কক্ষপথে দুই-মেগাওয়াট-ক্ষমতা সম্পন্ন একটি রাসায়নিক লেজার স্থাপন করে পারমানবিক বিস্ফোরণের ফলে অনুকণা-রশ্মিরেখার গতি-প্রকৃতির সমীক্ষা। কয়েক শত মার্কিন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ নিয়োজিত হয়েছিলেন ওই কর্মকান্ডে। বিশেষত রেগান আমলে। ১৯৬৮র মধ্যেই SDI-নেতৃত্ব ঐ সমীক্ষার কাজ শেষ করে কি করে ছোট আয়তনের যুদ্ধ-যানের (kinetic kill vehicles) মাধ্যমে শত্রু-পক্ষের উপগ্রহ ধ্বংস করা যায়, সেই পরীক্ষামূলক-প্রকল্পে হাত দেয়। এভাবেই নভোমন্ডল থেকে হানাদারির নিরীক্ষার সূত্রপাত। সোভিয়েত ইউনিয়নও পিছিয়ে থাকেনি (অবশ্য গর্বাচেভ - আমলের আগে)। পলিয়াস লেজার ক্যাননও SDI -উপগ্রহ ধ্বংস করতে পারত। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে (যা তার পতনের অন্যতম মূল কারণ) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মাতামাতি। এটা অবশ্য স্তালিন-অনুসৃত সমর নীতির অনুসরণ ও উত্তরাধিকার-বহন। এ নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই এই নিবন্ধে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক রাজনীতি ও নিরস্ত্রীকরণ গবেষণার প্রাক্তন অধ্যাপক ও ডঃ মতিন যুবেরির প্রামান্য গ্রন্থ Stalin and The Bomb -এ বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার প্রথম সারির বিজ্ঞানী লেভ লান্দাউ ও ফলিত

পদার্থবিদ্যার অন্যতম আধুনিক পথিকৃত পিয়তর কাপিতসার নিষেধ অমান্য করে স্তালিন (ও তাঁর বশংবদ গোয়েন্দা পুলিশ মন্ত্রী লাভরেন্তি বেরিয়া) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নেমে সোভিয়েত অর্থনীতির ভবিষ্যতকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেই অর্থনীতির বিপর্যয় থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বেরিয়ে আসতে পারেনি, যদিও ক্রুশ্চেভ-ব্রেঝনেভ আমলে সেই আত্মহননকারী নীতির লাগাম ধরার তেমন প্রয়াস হয় নি। অথচ ব্রেঝনেভ জমানাতে আর্ন্তজাতিক-উত্তেজনা প্রশমনকারী (দ্যতাঁত) নিবিড় প্রচেষ্টা হয়েছিল।

আজ মানব সমাজ জুড়ে চতুর্ধারে প্রতিবাদের ঝঞ্ঝা আলোড়িত হচ্ছে মানুষকে নিয়ে, মানুষের বসতি, বেঁচে-বর্তে থাকার ক্রম-তীব্র সংকটকে ঘিরে গোটা দুনিয়ায়। তার অন্যতম প্রধান বিষয় উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। বির্তকও তীব্র হ'তে তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু মহাকাশে, অন্য গ্রহে খবরদারির মাধ্যমে উপনিবেশ গড়ার স্বপ্নে ভিভোর নয়া-উদারপন্থী অর্থনীতির বাহক আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রেক্ষিতে যে আরো অনেক ভয়াবহ, সে নিয়ে প্রতিবাদের ঝাঁঝ কোথায়? উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন চর্চাও আংশিক ভাবে হ'লেও মহাকাশের বিষয় ও সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে। এ বিষয়ে সোভিয়েত পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ কে আনানিচেভের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য - "Development of a natural eco-system is, generally speaking, governed by the laws of cosmic influences (stability or catastrophes)" - বাঁকা হরফ প্রতিবেদকের। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা ও চর্চাকে কেবলমাত্র পার্থিব প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার অর্ন্তগত প্রক্রিয়া গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি।

ডিসেম্বরের (২০০৯) গোড়ার দিকে ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণাভিত্তিক একটি গবেষণা পত্রে প্রকাশিত হয় যে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উৎস বহির্বিশ্বে (outer space)। সায়েন্স পত্রিকায় এই গবেষণাপত্র 'Meteorite Krypton in Earth's Mantle Suggests a Late Accretionary Source for the Atmosphere' প্রকাশিত হয়। ঐ গবেষণা ও গবেষণাপত্রের নেতৃত্বে ছিলেন দঃ গ্রেগ হ ল্যান্ড। তিনি ঐ গবেষণা-ফল ব্যাখ্যায়নে বলেছিলেন - "We found a clear meteorite signature in volcanic gases ....From that we now know that the volcanic gases could not have contributed in any significant way to the Earth's atmospher. Therefore the atmosphere and oceans must have come from somewhere else, possible from a late bombardment of gas and water rich materials similar to comets ...Until now, no one has had instruments capable of looking for these subtle signatures in samples from inside the Earth - but now we can do exactly that." অর্থাৎ বায়ুমন্ডলে গ্যাসীয় পদার্থ পৃথিবী থেকে নয়, বহির্বিশ্বে থেকে এসেছিল। ঐ গবেষক গোষ্ঠী অগ্নুৎপাত - উৎসারিত ক্রিপটন ও জেনন (তেজস্ক্রিয় অনু-পদার্থ) পরিমাপ ও নিরীক্ষা করেছিল। সেজন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তার নাম মাল্টিকালেক্ট নোব্ল গ্যাস মাস যার দ্বারা অনেক আইসোটোপ একসঙ্গে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়। তাঁরা আদিম যুগে ঐ পরিমাপ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসীয় পদার্থগুলির অবশেষ চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য এ নিয়েও বির্তক উঠবে, মতান্তর হতে পারে। কিন্তু এই আবিষ্কার উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চর্চার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেই।

উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে চর্চা-বিতর্ক যৌক্তিকতা যথাসম্ভব সর্বস্তরে প্রসারিত করার (অবশ্যই আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ বাতায়নে) অনস্বীকার্য, তা অবহেলা বা নাকচ করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত কেবল বায়ুমন্ডলে সীমিত নয়। অন্যথায় এই বহুমুখ সমস্যার গভীরে যাওয়া যাবে না। এ নিয়েও চর্চা-বিতর্ক হোক। অন্তত বৈজ্ঞানিক মেজাজের (scientific temper) দিক থেকে এ নিয়ে খোলা মনে আলোচনা পর্যালোচনা কাম্য। উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন-এর সমস্যা মোকাবিলায় বিতর্কের চৌহদ্দি প্রসারিত করতে হবে। এ কথা ঠিক বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলবিদের উপর এই সংকট-গভীরায়নকারী বিষয়টি ছেড়ে দিলে চলবে না, তাঁদের পক্ষে একক ভাবে এর যথার্থ মোকাবিলা সম্ভব নয়। সে কারনেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সুশীল সমাজের পরিপূরক ভূমিকা এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এদের সীমাবদ্ধতা বাস্তব সত্য। সেহেতু পথ দেখাতে হবে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলবিদের, বিশষত আবহাওয়া পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ, আবহাওয়াবিদ, ভূ-বিজ্ঞানী ও এ সব নিয়ে গবেষণা-সমীক্ষা করছেন, সেই সব প্রকৌশলবিদেরা।

কার্ল মার্ক্স-এর গুরু হেগেল ইতিহাসকে কসাইখানার সঙ্গে তুলনা করে ছিলেন। বিজ্ঞান আরো কঠোর কসাইখানা, যেখানে নতুন নতুন তত্ব, ধারণা ও উপপাদ্য উন্মীলিত হয় ধারণা-ভাবনার বিতর্ক-যুদ্ধের মাধ্যমে (clashes of ideas)। উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন তার ব্যতিক্রম নয়।

জলবায়ু-পরিবর্তন নিয়ে কোপেনহেগেন আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন (COP 15) প্রায় তামাশায় পরিবসিত হ'ল। এটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রায় পক্ষকালব্যপী ১৯২ দেশের প্রায় ২০ হাজার প্রতিনিধির তর্ক-বিতর্ক অন্তে অশ্ব-ডিম্ব প্রসব

আন্তর্জাতিকতার মানব-কল্যাণমুখী সত্তার ধূল্যবলুণ্ঠন আরেকবার প্রমাণ করল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষাই (অর্থাৎ মুনাফাহারে অবাধ বৃদ্ধি সুনিশ্চয় করাই) প্রধান উদ্দিষ্ট। পিছিয়ে পড়া দেশগুলির (বিশেষত উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলি) মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন তাদের কাছে অতিশয় গৌণ। সম্মেলনের প্রাক্কালে ৪৪টি দেশের ৫৬টি সংবাদপত্রে অভিন্ন সম্পাদকীয় আকুল আবেদন জানিয়েছিল এই গ্রহের প্রাণি জগতকে অকাল বিনাশ থেকে বাঁচানোর অঙ্গীকার নিতে ও তা রূপায়ণে। COP 15 যেন বাদানুবাদের বাগড়ম্বরে পর্যবসিত না হয় বা পারস্পরিক দোষারোপের কানাগলিতে হারিয়ে না যায়, সেই আবেদন করা হয়েছিল। সেই আকুলতা অস্ফুট কুঁড়ির মত নেতিয়ে পড়ল। সাংবাদিকতার এক ঐতিহাসিক ও মানবিকতার অনন্য নজির ললিল ন্যূনতম মর্য্যাদাও পেল না কোপেনহেগেন সম্মেলনে। ঐ সম্পাদকীয়ের একাংশ দ্বর্থহীন ভাষায় ব'লা হল - "Unless we combine to take decisive action, climate change will ravge our planet, and with it our prosperity and security. The dangers have been becoming apparent for a generation. Now the facts have started to speak: 11 of the past 14 years have been the warmest on record, the Arctic ice-cap is melting and last year's inflamed oil and food prices provide a foretaste of future havoc. In scientific journals the question is no longer whether humans are to blame, but how little time we have got left to limit the damage. Yet so far the world's response has been feeble and half-hearted....."

মানবেতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতায় উজ্জ্বল সম্পাদকীয়টি একমুখিনতা বা একপেশেমির কলুষমুক্ত ছিল, প্রাঞ্জল উচ্চারণে বলেছিল- "The science is complex but the facts are clear. The world needs to take steps to limit temperature rises to 2C, an aim that will require global emissions to peak and begin falling within the next 5-10 years. A bigger rise of 3-4C -- the smallest increase we can prudently expect to follow inaction -- would parch continents, turning farmland into desert. Half of all species could become extinct, untold millions of people would be displaced, whole nations drowned by the sea".

শেষ দিনে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নৈরাশ্যসঞ্চারি বক্তৃতা শুনে মনে হল, তিনি জেনেশুনেই বিস্মৃত হয়েছেন তাঁর যুগান্তকারী বিজয়ের তাৎপর্য ও তজ্জনিত কর্তব্য। কোপেনহেগেনে তাঁর বক্তৃতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে মানুষ-বিরোধী ও সংকট-সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়ক জর্জ উইলিয়ম বুশের বাগাড়ম্বরের পুনরাবৃত্তি। ওবামা বেমালুম ভুলে গেলেন তাঁর অভিষেকের দিনে প্রবল শীত উপেক্ষা করে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর বিপুল জয় পরিবর্তনের সূচনা হোক, এই আশায় বুক বেঁধে ওয়াশিংটনের রাজপথে দাঁড়িয়ে ৮৭ বছরের তরুণ ও বামপন্থী গায়ক পিট সিগার গান গেয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের *আত্যন্তিকতা-হ্রাস* (তার সঙ্গে উষ্ণায়ন-গতিরোধ) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন (অর্থাৎ গোঁয়ার্তুমির অবসান) ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, এই সহজ সত্যটিও সম্পাদকীয় দ্বর্থহীন ভাষায় বলেছিল ! "Even now the world finds itself at the mercy of American domestic politics, for the president cannot fully commit to the action required until the US Congress has done so".

কিন্তু কোপেনহেগেনের ব্যর্থতার সব দোষ ওবামা বা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনায়কদের নয়। চীন শেষের দিকে তো আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়েছিল ভারতকে কোণঠাসা করার জন্যে। বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশ গুলির সংহতিকে চীন যেন প্রচন্ড কৌতুকে পর্যবসিত করেছিল। চীনের নেতৃত্ব কূটনৈতিক চালে তাদের অবস্থানের সাফাই গাইছেন। প্রধান মন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও তাঁর বক্তৃতায় উন্নয়নশীল দেশগুলির দারিদ্র্য দূরীকরণে ও পরিবেশের প্রশ্নে আপোষহীন অবস্থানের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমঝোতার উপর জোর দিয়েছিলেন - প্রযুক্তি ও লগ্নী পুঁজির জন্যে। যেন উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির দারিদ্র্য দূরীকরণে সততই চিন্তিত। (Endeavors to build global hope:chinese premier's 60 hours in Copenhagen 25 Dec 09- http://english peopledaily.com. on/90001/90776/90883/6851841.html) চীন, ব্রেজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ওবামার সঙ্গে আতাঁত করে যে বোঝাপড়া করল ও একটি চুক্তি-আবদ্ধ হল (যা বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশ গুলির সঙ্গে এ এক আদ্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা), তার উপক্রমনিকা যে রচিত হয়েছিল আমেরিকা-চীন যোগাসাজসে, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু কোপেনহেগেন সম্মেলন যে উন্নত রাষ্ট্রগুলি সাবোতাজ করতে চাইছিল, তা অনস্বীকার্যই নয়, প্রমাণিতও। লন্ডনের গার্ডিয়ান দৈনিক ফাঁস করে দিয়েছিল যে ডেনমার্কের নেতারা আধিপত্যকামী উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আঁতাত করে সম্মেলনে নিজেদের পছন্দসই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে। Copenhagen climate summit in disarray after 'Danish text' leak by John Vidal in Copenhagen, 8 Dec 09- http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/08/copenhagen-climate-summit-disarray-danish-text)

ঐ খসড়া দলিলের মোদ্দা কথা ছিল ঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত দলিলের বাইরে গিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাপে কার্বণ নির্গমন চুক্তিতে রাজি করানো, গরীব দেশগুলির মধ্যে বিভাজন (বেশি দূষণবিপদমুখী দেশগুলিকে আলাদা করা), জলবায়ু সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের তহবিল দুর্বল করা ও গরীব দেশগুলির জনপ্রিয় বার্ষিক কার্বন নির্গমন অনূর্ধ ১.৪৪ টনে বেঁধে দেওয়া (ধনী দেশগুলির বেলায় ২.৬৭টন)। সম্মেলন শুরুতেই এই পর্দা-ফাঁস আলোচনার পরিবেশটাই বিষিয়ে দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদায়ী সংস্থা ফ্রেন্ডস অফ দ্যা আর্থ কোপেনহেগেন সম্মেলনের ফলাফলকে যথার্থই 'পৃথিবীর হতদরিদ্রদের বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছে। কেন তা বিপর্যয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

এক, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ১৯৯০ এ গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন মাত্রা ২০২০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যাওয়া (তার মানে ক্লিন ডেভলপমেন্ট মেকানিজম-এর আশ্বাস বায়বীয় শূন্যতা); দুই, প্রায় তিন, শতাব্দীব্যাপী আবহাওয়া দূষণের দরুণ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশ গুলিকে দেয় ক্ষতিপূরণের দায় (climate debt) অস্বীকার; তিন বনাঞ্চলগুলি ধ্বংস করার জন্য পরিবেশগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে কার্বন ঋণপত্র-প্রদানে (বা carbon offsetting initiatives এর আওতায় আনা) অস্বীকার ও চার, পরমাণু বিদ্যুৎ ও ভেরেন্ডা বা জৈব-জ্বালানী (biofuels) ইতদ্যিকে জীবাশ্ম-জ্বালানির বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার অপচেষ্টা বহাল রাখা।

আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধ-সংগঠক মার্কিণী সামরিক কেন্দ্র পেন্টাগণের কর্তারাও। ফরচুন পত্রিকায় ডেভিড স্ট্রিপ-এর লেখা পড়ে অনেকের চমক জেগেছিল (ওয়াকিবহাল বিজ্ঞানীদের কথা বলছিনা - শিরোনাম ছিল 'ক্লাইমেট কোল্যাপ্স - দি পেন্টাগণ'স ওয়েদার নাইটমেয়ার'। মার্কিণী সমর নায়কেরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন - উষ্ণায়ন থেকে ব্যপক খরা? না শীতলীকরণের দীর্ঘায়ত পর্ব। প্রথমটির ফলে হাজার হাজার হেক্টর আবাদী ক্ষেত্র ঊষর, মাইলের পর মাইল বণভূমি ভস্মে পরিণত হ'তে পারে। দ্বিতীয়টি হ'লে উত্তর গোলার্ধের বিপুলাংশে (উত্তর আমেরিকা ও য়োরোপ সহ) শীতের মরশুম দীর্ঘায়ত হবে (Growing evidence suggersts the ocean-atmosphere system that controls the world's climate can lurch from one state to another in less than a decade--like a conoe that's gradually tilted until suddunly it flips over. Scientists don't know how close the system is to a critical threshold. But abrupt climate change may well occur in the not-too-distant future. If it does, the need to rapidly adapt may overwhelm many societies ---thereby upsetting the geopolitical balance of power. Though triggered by warming, such change would probably cause cooling in the Northern Hemispher, leading to longer, harsher winters in much of the U.S. And Europe. Worse, it would cause massive droughts, turning farmland to dust bowls and forests to ashes. Picture last fall's California wildfires as a regular thing.)।

এই দুই আশংকাই অমূলক নয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদ-শিরোমণি মার্কিণ রাষ্ট্র-নেতৃত্ব কিয়োতো প্রটোকলে স্বাক্ষর করে নি। কারণ 'কার্বন নির্গমনের হার ৫ শতাংশ কমালেই আমাদের স্বাধীন জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে' (জর্জ উইলিয়ম বুশ)। ডেভিড স্ট্রিপ বাস্তব সত্যই উদঘাটিত করেছিলেন ২৫৬০ শব্দের নিবন্ধে। সাম্রাজ্যবাদ তথা একচেটিয়াপুঁজিবাদ (বা 'সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক বস্তুসার' - লেনিন) মুনাফার জন্য যত বেপরোয়া হবে, তত সংকটের অক্টোপাস তাকে জড়িয়ে ফেলবে। উষ্ণায়ন বা আবহাওয়া পরিবর্তন আংশিকভাবে সেই কাঠামোগত সংকট-প্রক্রিয়ায় বলশালী অনুঘটকের ভূমিকায়। তা থেকে রেহাই পাবার জন্য জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উথাল পাথাল প্রয়াস চালাচ্ছে। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যাক। এন বি সি নিউজ চ্যানেলের সংবাদ দাতা জিম ম্যাসেডার একটি খবরে জানা গেল, পেন্টাগণ এখন মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব নিরীক্ষা করছে। অবসর প্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল এন্টনি যিনি ২০০৭ সালে উষ্ণায়ণ ও আঞ্চলিক সংঘর্ষের সম্পর্ক নিয়ে একটি মৌলিক সমীক্ষা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, মিশর আগামী দিনে আঞ্চলিক সংঘাতের ১০টি প্রধান এলাকা হয়ে উঠবে। ওই ব-দ্বীপ এলাকা সংকুচিত হচ্ছে, আরো সংকুচিত হবে আর সে জন্যেই মার্কিণ নৌ-বহর ঐ অঞ্চলের উপর ঈগল পাখির নজর রাখছে।

ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োফিজিক্স কেন্দ্রের গবেষণার পরিচয় বহন করে নাসা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত বক্তব্যেই আছে। "We are funded by NASA for one current projefct. Our work in this area began in 2003 with an exploration of the effect on the Earth of radiation (X-rays and gamma rays) from a gamma-ray burst in our Galaxy..... Our projects fall into three main areas, which we explore below in a tree structure with links. We probably all have heard of solar flares, when we get a little extra dose of radiation from the sun. There are also occasional much more powerful flares. Supernovae go off in our Galaxy, and if they happen to lie within a few

tens of light-years, the effects can be disastrous. Some supernovae produce gamma-ray bursts, in which the radiation is collimated into narrow jets that can easily do serious damage from half-way across the galaxy. Estimates suggest that such events should befall the Earth, with potentially serverely damaging events likely on a timescale of a few hundred million years. Our first efforts, and still the most prolific, lie in this area. In the sections below, we explore several diferent likely or possible kinds of radiation events and their effects on the Earth."

জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের প্রকৃতি ও পরিমাপ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেনি বিজ্ঞানীরা। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এই শতক-অন্তে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৫.৮ ডিগ্রি বেড়ে যাবে এবং তা হ'লে অনেক দেশ (বিশেষত উপকূলবর্তী দেশ ও অঞ্চল গুলি) ডুবে যাবে, তার মধ্যে থাকবে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিও। কিন্তু এই ৫.৮ ডিগ্রির ভিত্তি ইন্টার-গভর্ণমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) ৪র্থ রিপোর্ট। আইপিসিসির ১০,০০০ আবহাওয়া পরিমাপ অধিকাংশই গ্রামীন। সুতরাং আইপিসিসির হিসেবে urban bias অনিবার্য। কয়েকমাস আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও আলিপুর আবহাওয়া কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওর্য়াকশপে উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও ভূ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রফিক আহমেদ আইপিসিসির তথ্য-পরিসংখ্যান সম্পর্কে জোরালো প্রশ্ন তুলেছিলেন। নাসার হিসেব শীতলায়ন শুরু হয়েছে ২০০৬ থেকে।

সুতরাং উষ্ণায়নের মাত্রা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি এখনো। অবশ্য অনেকের মতো এই প্রতিবেদক মনে করে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ব'লে কিছু নেই। কিন্তু এ নিয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র (বিশেষত মহাকাশ) গবেষণা কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা পরিবেশবিদদের তো বটেই, পরিবেশ আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা আছেন, তাদের পক্ষেও জরুরী। পেন্টাগণ এভাবেই জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের বিষয়টি দ্যাখে। আগেই বলেছি জলবায়ু ও উষ্ণায়ন নিয়ে পেন্টাগণ তথা নয়া-উদারপন্থী রাষ্ট্রনায়কেরা উভয় সংকটে। রিয়ো ডি জ্যানেইরো, কিয়োতো, জোহানেসবার্গ ও কোপেনহেগেনের মত মহা/শীর্ষ সম্মেলন বার বার হবে। উভয় সংকটে শিহরিত উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি তা থেকে রেহাই পেতে চাইবে অন্য দেশগুলিকে কব্জায় আনার জন্যে। অনুন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলিকে তার মোকাবিলা করতে হবে ইতিহাস-নির্ভর ও বাস্তব-বৈজ্ঞানিক অবস্থান থেকে। তার জন্যেই প্রয়োজন মহাকাশ থেকে মহাসমুদ্র - এই ব্যাপক প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের লড়াই জারি রাখতে হবে। চীন সম্পর্কে (ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব সম্পর্কেও) কোন মোহাবিষ্ট হওয়া বোকামি। দূষণে ২০০৬ থেকে চীন এক নম্বর, তার পরে আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারত (China biggest carbon polluter, world levels at record: scientists by Staff Writers Paris (AFP) 26 September 2008. http://www.terradaily.com/reports/Cjoma _biggest_carbon_polluter_world_levels_at_record_scientists_999.html)

তদানীন্তন কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ট্রোর ১৯৯২ সালের প্রস্তাব (২০০২ এ জোহানেসবার্গে ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাস্টেইনেব্‌ল্ ডেভেলপমেন্ট-এ কিউবার বিদেশ মন্ত্রী ফেলিপে পেরেজ রোক পুনরায় তুলে ধরেছিলেন) আজও প্রাসঙ্গিক। তার অংশবিশেষ স্মরণ করিয়ে দিই।

- আমরা যদি মানব সমাজকে আত্মবিনাশ থেকে বাঁচাতে চাই, বিশ্বের সম্পদ ও লভ্য প্রযুক্তির সুষম বন্টন জরুরী। পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য লাঘবে কতিপয় রাষ্ট্রের বিলাসবাহুল্যের অবসান অত্যাবশ্যক।
- আগে পরিশোধ করা হোক বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলির প্রাপ্য পরিবেশগত ঋণ (কয়েক শতাব্দীব্যপী প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের ফলে প্রাকৃতিক পরিমন্ডল দূষণ), বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে বৈদেশিক ঋণশোধ নয়।

কাস্ত্রো যখন এই প্রস্তাব করেছিলেন, প্রায় দু'দশক পূর্বে, পৃথিবীর ৮১ কোটি মানুষ বুভুক্ষু ছিল। চরম দারিদ্র-ন্যুব্জ ১২০ কোটি মানুষ। ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ফলশ্রুতি এই চূড়ান্ত অমানবিক বিকাশ। রিয়ো থেকে কোপেনহেগেনের দীর্ঘ অন্তবর্তী কালে এই দুস্থতার মর্মন্তুদ তথ্যাদি উন্নত দেশগুলির সামনে বার বার হাজির করা হয়েছে। তার উত্তরে মিলেছে বহু শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি। গরীব রাষ্ট্রগুলিকে জনকল্যাণকর বিকাশে সাহায্যের পরিবর্তে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে, মহাকাশ গবেষণা, মুনাফা-লক্ষ্যে জৈব-প্রযুক্তি গবেষণার আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কোপেনহেগেনে সেই মনোভাব উচ্চকিত।

রবীন্দ্রনাথের 'আলোকধেনু সূর্যতারা' আজ মুনাফা-ক্ষত, তাঁর দেখা অম্বর সদাই নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করছে। আর জীবনানন্দের শকুনেরা সত্যিই "পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে" গেছে "অন্য কোন মৃত্যুর ওপারে"।

নয়া-উদারতন্ত্রী পুঁজিবাদের দৌরাত্মে যারা আকাশ-মাটি সর্বত্র *স্বরাট*, তাদের "হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই- প্রীতি নেই - করুণার আলোড়ন নেই।"

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সুব্রত সিনহা

Global Warming and Climate Change — বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু সংক্রান্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন। এই অঘটনের ব্যাপ্তি এবং অভিব্যাক্তির ফলে আজ সারা বিশ্বের জল, মাটি ও আকাশ, এমনকি তার প্রাণীসমূহকেও এক ভয়াবহ সংকটে দাঁড় করিয়েছে। এই বাস্তবতা আজ প্রায় সব দেশকে মানতে হয়েছে। সব ধরনের সংবাদ মাধ্যমে, এমনকী ইন্টারনেটেও এই ভয়াবহ সমস্যা সর্বাগ্রাধিকার পেয়েছে। তবে, অনুতাপের বিষয় যে— বেশির ভাগ বাংলা ভাষায় খবরের কাগজে এর কোনো উল্লেখনীয় প্রাধান্যই পায়নি; যদিও পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশ — এই দুটি দেশ, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সবচেয়ে বেশী এবং তাড়াতাড়ি বিপদের সম্মুখীন হয়ে যাবে।

এর সমাধানের সূত্র সন্ধান করবার জন্য বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক স্তরে বিচার বিশ্লেষণে অনেক সভা সমিতি করা হয়েছে; তাছাড়া মিছিল পথযাত্রা তো আছেই। আন্তর্জাতিক স্তরে, United Nations অর্থাৎ রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্গত ১৩টি সংস্থা একত্রিত হয়ে বহু দেশের অনেক বিশেষজ্ঞের সাহায্যে এই সহস্রাব্দের শুরুতেই ২০০১ সালে "Mellenium Development Goals" প্রকাশ করেছিল। আশা ছিল যে এর অনুমোদনগুচ্ছ বর্তমানের বিনষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশকে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। এটাই প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে একটা সুসম ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে সেটাকে ধরে রাখার একমাত্র উপায়; এই শেষ চেষ্টা, আশু বিপর্যয়ের অশনি সংকেতের ফলেই নেওয়া হয়েছিল।

তবে গত দশকে দ্রুত বিশ্বায়ণ (Globalisation), কেনা বেচার শক্তিপুঞ্জ (Market force) ও ভোগ্যপন্য ভিত্তিক (consumerism) সভ্যতার দুরন্ত দাপটের জোরে, বিশ্বউষ্ণায়ন (Global Warming) তার বিষাক্ত ছোবল মারছে। এতেও হার না মেনে, ইউনাইটেড নেশান শেষ রক্ষা করবার জন্যে আবার উঠে পড়ে লেগেছেন। ক্রমাগত আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন মহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে হল ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে বিশ্বদরবার। এতে ভাগ নিয়েছেন একশ বিরানব্বইটি দেশের পনেরো হাজার প্রতিনিধি।

অনেক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সর্বদেশ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে, কোপেনহেগেনে উন্নত, উন্নতিশীল, এবং অনুন্নত দেশের দর কষাকষি চলতে থাকবে। তর্ক-বিতর্কের প্রধান বিষয় new and renewable energy যে নতুন পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি যা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদের দায়-ভার কারা বহন করবে! সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ লিপিবদ্ধ করা হবে সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিতে শেষ দুদিনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (Plenary Session)। তবে যেহেতু জল-মাটি-আকাশে ভয়ানকভাবে হানিকারক অবস্থা রাজনৈতিক সীমারেখা মেনে চলে না, এটা নিশ্চিত বলা যায় যে, কার্যকরী রূপরেখা তৈরী হবেই। উন্নত ত বটেই আমাদের মতো উন্নতিশীল দেশেরও যথেষ্ট আর্থিক সম্ভার আছে, যাকে অন্যান্য পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক পরিকল্পনা বন্ধ করে এই আত্মরক্ষার কাজে ব্যয় করা যায়। ইচ্ছা থাকলে উপায় বেরিয়ে আসবে; তবে অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্যের হাত আর সকলকেই বাড়িয়ে দিতে হবে।

এরপর সেগুলোকে কার্যকরী করার পালা শুরু হবে প্রত্যেক দেশে, সৌভাগ্যবশত অনেক অপরাধী দেশ ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে আছে অনেক অনুন্নত দেশ, যার মধ্যে চিনও আছে। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের অবস্থিতি এখনও সুস্পষ্ট নয়। যেখানে 'যত মত তত পথ' এর মৌরসীপাট্টা, যদিও এই মনুষ্যকৃত দুর্যোগ, ডেমোক্রেসি বা অটোক্রেসি চিনতে পারে না-ঠিক যেন 'নদী আপন বেগে পাগল পারা'! দেখা যাক্। এখন চলছে এই নিয়ে রাজনৈতিক পাশা খেলা। একমাত্র, প্রবল জনমত গড়ে তুলতে পারলেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গুলো মেনে নিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া

আরম্ভ করবেন। ঠিক যে রকম সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের জনপ্রতিরোধ সারা দেশে জমি দখলের গতিপথ বদলে দিয়েছে।

সংকট আজ এমন স্তরে গিয়ে ঠেকেছে যে তার কুফল অবশ্যম্ভাবি, ঠিক যেন মানুষের অন্তর্জলী যাত্রা। শেষ রক্ষা কী করা যাবে? এর উত্তর আগামী প্রজন্মদের উপর নির্ভরশীল, কেননা তাদের সক্রিয়তাতেই শত্রু পিছু হঠতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত স্কুল-কলেজ পরিবেশ পাঠক্রম বাধ্যতামূলক। সম্প্রতি, স্কুলে ছাত্রছাত্রীরাও পদযাত্রা ও মিছিলে সামিল হয়েছিল "বিশ্ব-উষ্ণায়ণ" প্রতিহত করার তাগিদে।

এবার এই অবস্থার ঐতিহাসকি বিশ্লেষণ করা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর 'শিল্প বিপ্লব' (Industrial Revolution) পর্ব থেকে প্রকৃতির উপর মানব জাতিরই কিছু শক্তিশালী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান নির্মম আক্রমনের ফলেই আজ আমরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চলে এসেছি। এমনকী, এর ফলে মানবজাতির অবলুপ্তি ঘটে যেতে পারে, হয়ত এই শতাব্দী পার হবার আগেই। অর্ধশতাব্দী পার হবার আগেই অনেক অঞ্চল সমুদ্রলগ্ন দেখা যাচ্ছে, নানা জায়গায় অনেক মহাদেশে। এমনকি গোটা নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়েছিল।

বিশ্বউষ্ণায়নের আঁচ ২০০৯ এর পশ্চিমবঙ্গে অনুভূত হয়েছে ঋতুচক্রের (বিশেষত গরম, বৃষ্টি ও শীত) অস্বাভাবিকতা। ভাবা দরকার যে বিশেষভাবে চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার নিম্নভূমি - যার মধ্যে কলকাতাও আছে। আর নয়াচর দ্বীপের অতলে তলিয়ে যাওয়াও তো অবধারিত। এটাও ধ্রুব সত্য যে "মৌসুমী জলবায়ু" কিন্তু দেশ অথবা মহাদেশের সীমা রেখা মেনে চলে না। এটাও বুঝতে হবে যে দেশের অভ্যন্তরীন নিয়ম কানুনও এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার (system) ওপর প্রযোজ্য নয়। অথচ এই প্রাকৃতিক লীলা খেলার দাপট এমনি সর্বব্যাপী যে এর প্রভাবে যে কোন দেশের আভ্যন্তরীন পরিবেশগত অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্রতলে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এটাও দুর্বোধ্য যে বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তি অভাবনীয় উন্নতি-যা ভাবা যায় না। এই অবস্থার জন্য বহুলাংশেই দায়ী। উদাহরণ হিসাবে রাখা যায় যে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অনন্য সাধারণ গবেষণার ব্যবহার করে কিছু দুরভিসন্ধিমূলক গোষ্ঠীচক্র আনবিক বোমা তৈরী করার মূলমন্ত্র পেয়েছিল। অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিকাশে ভাল এবং মন্দ দুদিকই আছে — ফলাফল ব্যবহারকারীদের সততা এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। বিগত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং তার শেষ দুই দশকে বিশ্বায়ণের ধাক্কায় প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের প্রকোপ অনেক বেড়ে গিয়েছে। অবশ্য এটাও অনস্বীকার্য যে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আজ চিকিৎসা শাস্ত্র অভূতপূর্বভাবে উন্নত।

Global Warming and Climate Change -এর ফলশ্রুতি হিসাবে ঘটবে ব্যাপক মহামারী, খাদ্য-অভাব, অনাবৃষ্টি ও বন্যা এবং অনেক বেশী ঝড় -ঝঞ্ঝা; কেননা সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেখানে সহজে খাদ্যোৎপাদন হয়ে থাকে — বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। হিমালয়ের হিম প্রবাহ (Glacers) গলে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে যা আমাদের মহাদেশের খাদ্যসম্ভারের ওপরে কশাঘাত হানবে। ২০০৭ থেকেই এই সব লক্ষণ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে আর্থসামাজিক ভারসাম্য তছনছ হয়ে যাবে। আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র পরিবেশ আজ বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত।

তবে একটা আশার আলো হচ্ছে যে প্রাকৃতিক খনিজ কয়লা ও তৈল সম্পদ (Non-renewable natural resources) যা শিল্প সভ্যতার কাছে বলিপ্রদত্ত, তা নিঃশেষ হতে চলেছে। অন্যদিকে প্রাক্রিতিক চক্র ও শৃংখলা (Natural cycle and chains), জল-বায়ু, ভোগের বস্তু, জল, খাদ্য-সবগুলো অকেজো ও কুলষিত হয়ে যাচ্ছে। মোদ্দা কথা নিরুপায় হয়েই এই ভয়ঙ্কর শিল্প সভ্যতা অতলে তলিয়ে যাবে। সেটা উপলব্ধি করেই উন্নত দেশগুলোর কর্ণধারদের প্রয়াস হোলো পৃথিবীতে প্রাচুর্য্যময় জীবনশৈলি (affluent lifestyle) কমানো।

মহাত্মা গান্ধির অনেক পরিবেশ সংক্রান্ত বক্তব্য কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার দিকে আঙুল তুলেছিল - যে উপদেশ মানলে হয়তো মানুষ এই পরিণতি থেকে বাঁচতো। গান্ধিজীর জীবনদর্শনের অমূল্য নির্যাস যে প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে, কিন্তু লোভের নিবৃত্তি করতে পারে না ('Nature provides enough for men's Needs but not for his Greed')। কথাটি যদি মানবজাতি আজ ঠেকে বুঝতে পারে, তাহলে এটাই এই মরণ-বাঁচন সমস্যা সমাধানের সুত্র হতে পারে।

মোবাইল টাওয়ার কতটা ক্ষতিকর ও পরিবেশ বিনষ্টকারী

অরুণকান্তি বিশ্বাস

মুঠো ফোন অর্থাৎ সেলফোন ও তাকে সচলরাখার জন্য মোবাইল টাওয়ারের প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে আমাদেরকে গত শতাব্দীর কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গবেষণাকে জেনে নিতে হবে। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা পরম্পরায় ১৮৮৭ সালে জার্মানীর অন্যতম বিজ্ঞানী হার্জের বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি এবং তার পরে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হার্জের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

১৮৯৪ সালে এক যুগান্তকারী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বসে তিনি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে প্রথম ঘরের দেওয়াল ভেদ করে দ্বিতীয় ঘরে রাখা একটি পিস্তলথেকে গোলা ছুড়তে সক্ষম হলেন। ১৮৯০ এর দশকে জগদীশচন্দ্র বসু মাইক্রোওয়েভ (মিলিমিটার তরঙ্গ) আবিস্কার করেছিলেন। তখন এর সুদূর প্রসারী প্রভাব উপলব্ধ হয়নি, হয়েছে অনেক পরে। মাইক্রোওয়েভের বিশেষ কিছু ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এই তরঙ্গগুলিকে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্পর্কে আগাম খবর জানা, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলে ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সমুদ্র জাহাজ এবং বায়ু মণ্ডলে উড়োজাহাজের গতি নিয়ন্ত্রন করা, বিমানের নিরাপদ অবতরন করানোর কাজে, তাপ উৎপাদনে (মাইক্রোওয়েভ ও ভেন) ব্যবহার টেলিভিশন এবং মোবাইল ফোনও মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি নির্ভর।

মাইক্রোওয়েভের বিশেষ কিছু ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, আজকের প্রযুক্তি কিভাবে মানুষের উপকারে আসছে ও তার অপব্যবহার কিভাবে হচ্ছে তা নিয়ে উন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলো ভাবনা চিন্তা করছেন। মোবাইল সংস্কৃতি কতটা প্রয়োজনীয় আর কতটা অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসিতার উপকরণ, তা নির্ধারন করছে বেশ কিছু টেলিকম কোম্পানী। বিভিন্ন লোভের হাতছানি দেখিয়ে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস্কারী মানুষদের হাতেও পৌঁছে দিচ্ছে এই কোম্পানীগুলো। আর উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তরা তো একটা নয়, দু'টো তিনটে মোবাইল ফোন নিয়ে নিজেকে গন্যমান্য প্রমান করার চেষ্টায় আছেন। দেখা যাচ্ছে ভারতে মোবাইল এসেই ২০০৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানে চীনের পরেই এসে গিয়েছে ও ২০১১ তে কমপক্ষে ৫০ কোটি গ্রাহক ধরবে বলে সিদ্ধান্তে এসেছে এই সব ব্যবসায়ী টেলিকম কোম্পানীগুলো। মোটারোলা (motorola) কোম্পানীতে কর্মরত মার্টিন কুপার নামে একজন গবেষককে মোবাইল ফোনের আবিস্কারক বলে চিহ্নিত করা হয়।

মোবাইল ফোন থেকে নির্গত তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের এলাকার মধ্যে মানব শরীরের ওপর মোবাইল ফোনের প্রভাব নিয়ে কতকগুলো বিষয় আজ প্রমানিত - যেমন হৃদস্পন্দন, মস্তিস্কের তরঙ্গ (Brain Wave), রক্ত-মস্তিস্কের ব্যবধান (blool-brain barrier), অণ্ডকোষে, শ্রবনেন্দ্রিয়, ত্বকের ওপর তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরনের প্রভাব।

মস্কোর আইজার বেলওয়েভ দেখেছেন, একটা সেলফোন থেকে যে পরিমান মাইক্রোওয়েভ বিকিরিত হয়; তার চেয়ে ১৬ গুন কম বিকিরণে ব্যাকটেরিয়া ডি.এনএ (Bacterial DNA) অনুরণিত হয়। জামার্নীর এক গবেষক ডব্লু গ্রাণ্ডলার বলেছেন যে শূন্য মাত্রার কাছাকাছি বিকিরণেও ইষ্ট কোষ বৃদ্ধি পায়। সুইজারল্যান্ডের সায়ারজন বাগ দেখেছেন এই সব সর্ট ওয়েভের ধারে কাছে থাকা লোকজন ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রাজনিত রোগের শিকার হন। অর্থাৎ মাইক্রোওয়েভের প্রভাব অনেকাংশেই পরমানুশক্তির মতন। কোন 'নিরাপদ মাত্রা' নেই। তড়িৎচুম্বকীয়তার ক্ষেত্রে যে কোন মাত্রাই বিপদজনক।

এবার আমি যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে এই মোবাইল ফোনগুলো সচল থাকে, সেই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

সঞ্চারের প্রাণভোমর, তথা মোবাইল টাওয়ারের কথায় আসব। এই মোবাইল টাওয়ারের মাধ্যমেই মোবাইল হ্যাণ্ডসেট থেকে অর্থাৎ প্রেরকের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্যস্রোত থেকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে নিকটবর্তী টাওয়ারে পৌঁছায়। সেই টাওয়ার থেকে পরবর্তী টাওয়ার এভাবে টাওয়ার বাহিত হয়ে গ্রাহকের হ্যাণ্ডসেটে গিয়ে পৌঁছয় এবং গ্রাহক সেই বাক্য স্রোত শুনতে পান। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই টাওয়ারগুলোই দূরসঞ্চারের মূল হোতা। সাধারণ এই টাওয়ারগুলো গৃহস্থবাড়ীর ছাদে, উঁচু উঁচু থাম তৈরী করে অথবা কোন উঠোন চত্বরে বাসানো হয় তার উপরে বসানো হয় প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র। শক্তি যোগান দেওয়ার জন্য থাকে শক্তির উৎস বা পাওয়ার সোর্স। এই টাওয়ারগুলি চালু রাখার জন্য থাকে ব্যাটারী বা বিকট শব্দকারী জেনারেটর, যাতে সারাদিন সারা সপ্তাহ, সারা বছর একটানা শক্তি যোগান দেওয়া যায়।

এই টাওয়ারগুলি থেকে নির্গত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী (RF) তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের মাধ্যমে (electromagnetic radiation EMR) ২ থেকে ২.৫ মাইল সহজে পৌঁছে যায়। এরমাত্রা অনেকটাই মাইক্রোওয়েভের বিকিরণের মাত্রারমতো। ফলতঃ এই অল্পশক্তির বিকিরণ সেল ট্যিসু (cell tissue) ও DNA-এর পরিবর্তন ঘটায় এবং ব্রেন টিউমার, ক্যান্সার, গর্ভপাত, অ্যালজাইমার সূচিত করতে পারে। শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। দেখা গেছে শিশুরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তাদের করোটি পাতলা ও বেড়ে ওঠার সময় বলে তাদের কোষ বেশী সক্রিয়। যদিও বয়স্ক মানুষরা ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। UK-র ডাক্তার বাবুরা তো নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন যে ১৬ বছরের কমবয়েসী ছেলেমেয়েরা যেন মোবাইল ফোন ব্যবহার না করে, রেডি ফ্রিকোয়েন্সী (RF) থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকা যায়।

বর্তমানে আমেরিকা মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ মাত্রা বেঁধে দিয়েছে ৫৮০ থেকে ১০০০ মাইক্রোওয়াট প্রতি বর্গ মিটারে 580-1000$\mu W/cm^2$। ইউরোপীয় দেশগুলির মাত্রা আমেরিকা নির্ধারিত মাত্রা থেকে ১০০-১০০০ গুন কম, অষ্ট্রেলিয়ার মাত্রা 200$\mu W/cm^2$, রাশিয়া, ইটালী ও টরেন্টোর 10$\mu W/cm^2$, চীন ও সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া যথাক্রমে 6,4 and 1$\mu W/cm^2$, যদিও দেখা যায় টাওয়ার থেকে নির্মিত বিকিরণ মাত্রা (RF) এর থেকে কম হওয়া সত্বেও শারীরিক ক্ষতি হতে থাকে। এমনকি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে 0.01 - 100$\mu W/cm^2$ মাত্রার বিকিরণেও শরীর ও জীবকোষের ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ এখানো পর্যন্ত সঠিক নিরাপদ বিকিরণ মাত্রা ধার্য করা সম্ভব হয়নি (Viena conference 1998)।

FCC (The US Federal Communication Commission) যাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো বিকিরণের মাত্রা ঠিক করার, তাঁরা ইন্ডাষ্ট্রিগুলোর লগ্মীকরা টাকা ($40 billian ডলার) বরবাদ হবে বলে বলেছেন যে US নির্ধারিত মাত্রাই সঠিক। ক্যাথি বার্গম্যান ভেনিজা (Cathy Berman-Veniza), 1996 - Vermant Law School Environmental Law Center এ-অনুষ্ঠিত এ অনুযোগ করেছেন যে ইন্ডাষ্ট্রিগুলো যা বলাতে চাইবে FCC কে তাই বলতে হবে। যেমন একসময় এরাই বলেছিলেন অ্যামবেসঠম, সিগারেট, থালিডোমইড (thalidomide) ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় না যা আজকের পরীক্ষায় ভুল প্রমানিত হয়েছে। EPA (Environmental Protection Agency, US) WHO (World Health Organisation), FCCO-এর সাথে একমত নন, বরং বলেছেন EMR সম্ভবত কারসিনোজেন (carcinogen) অর্থাৎ ক্যান্সারের কারণ। দু'বার মেডিসিনে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত পদার্থবিদ ডঃ গেরাউ হাইল্যান্ড (Dr Gerard Hyland) বলেছেন যে "বর্তমানে মোবাইল টাওয়ার নির্মানের জন্য বা বানানোর জন্য যে নিরাপদ গাইড লাইন তৈরী হয়েছে তা অর্পযাপ্ত যেহেতু এই সব সাইডলাইনে তাপমাত্রা জনিত বিকিরণের কথাই ধরা হয়েছে thermal effects of exposure"।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে বিধিনিয়ম অনুসারে মোবাইল টাওয়ার বানানোর আগে মিউনিসিপালিটি ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে। জনবসতি থেকে কমপক্ষে ৩৬ মিঃ দূরে, হাসপাতাল বা স্কুলচত্বরে বানানো যাবে না এবং টাওয়ারের অ্যান্টেনার মুখ সরাসরি কোন বাড়ীর দিকে রাখা যাবেনা, শুধুমাত্র ৫০০০ টাকা ফাইন দিয়ে বিধি নিষেধ ভাঙ্গা যাবেনা, কোম্পানীর হয়তো কিছু বাড়তি খরচ

হবে, সামাজিক দায়িত্ববোধের, পরিবেশরক্ষা করার কথা মাথায় রাখতে হবে। যত্রতত্র মোবাইল টাওয়ার বানানো যাবে না। আমাদের দেশের টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট ১৯৯৬ অনুযায়ী জনসাধারনের ক্ষতি হচ্ছে এই মর্মে কোন প্রতিবাদ করা যাবে না।

কিন্তু আমরা প্রতিরোধ করতে পারি অনেক সংখ্যক মোবাইল টাওয়ার বানানোর বিরুদ্ধে কারণ এর থেকে সামগ্রিকভাবে তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের মাত্রা বেড়ে যায়। জন প্রতিনিধিরা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, কারণ জনসাধারণের ভালোমন্দ শারীরিক অসুবিধার ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিরাই একমাত্র বাধ্য থাকবেন। যদিও ইতিমধ্যে অ্যাক্টের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করা হয়েছে।

আসুন আমরা সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলি, সেলফোনের ব্যবহার কমাই, ও নাগরিক হয়ে উঠি।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। *"আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু" বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রকাশিত, ২০০২*

২। *আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঃ ১৫০তম জন্ম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী - আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ১৫০ তম জন্ম শতবার্ষিকি উদযাপন কমিটি প্রকাশিত, ২০০৮*

৩। *"মোবাইল একটি চলমান বিপদের ধারা বিবরণী" সবুজ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান অন্বেষক ও চাকদা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক সংস্থা প্রকাশিত, ২০০৮*

৪। *অজানা দূষণ - তরুণ কুমার দে, সপ্তাহ পাবলিকেশনস্, ২০০১।*

৫। *শ্রমজীবি স্বাস্থ্য - জানুয়ারী ২০০৯*

৬। *"মোবাইল টাওয়ার - এর গোপন দূষণ কথা " সুভাশিস মুখোপাধ্যায়। দুর্বার ভাবনা বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, জুলাই, ২০০৯।*

৭। *www.monntshastaecology.org*

৮। *www.lineindia.com*

ব্যতিক্রমী কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

নিউক্লিয়ার বোমানয় □ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা

□ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা □ পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

□ পরিবেশ আইন-কানুন □ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

□ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ □ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

□ পরমাণু চুক্তি নয় - বিকল্প শক্তিই ভরসা

পাওয়া যাবে দুহাজার দশ -এর কলকাতা বইমেলায় বিওবি-র স্টলে ও অন্যত্র।

বিওবি-তে আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য ডাকযোগে এবং / অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাড়ে আটটা)

২/১ এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

পূর্বকলকাতার জলাভূমি ও আশ্রিত মানুষ —ভবিষ্যৎ কি?

উজ্জয়িনী দাস

বাইপাসের গায়ে রুবি হসপিটাল থেকে মিনিট সাতেকের পথ হাঁটলেই দেখা যাবে টিনের উঁচু বেড়ায় ঘেরা ছ'শ বিঘে জমি (মৌজা মাদুরদহ, জে.এল নং ১২, খতিয়ান নং ১৯৫, দাগ নং ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৫) যেখানে তৈরী হচ্ছে এন্. আর. আই. কমপ্লেকস্ টোডিগ্রুপ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে। গড়ে তোলা হবে চল্লিশ তলার পাঁচটি ও পঁয়তাল্লিশ তলার দুটি ফ্ল্যাটবাড়ি আর দু'শর ওপর দোতলা-তিনতলার বাংলো। ফ্ল্যাটের ন্যূনতম মূল্য আশি লাখ, বাংলোর আরো অনেক বেশি।

ওই ছ'শ বিঘে জমির সবটাই একদিন ছিল জলাভূমি। মাছ চাষ হতো জলাভূমি জুড়ে, - নাম ছিল রায়ভেড়ি। জলাভূমিকে বসতজমিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলেছে পূর্বকলতাকার নানা অঞ্চলে। তার মধ্যে নানাকারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই রায়ভেড়ির রূপান্তর। মাছচাষকে অবলম্বন করে এই ভেড়ির একধারে বাসবাস করত রাঁচি-ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আনা একদল শ্রমিক। মাছচাষ বন্ধ হওয়ার পর ধানচাষের কাজে বহাল ছিল তারা। আজও প্রায় আশি ঘর সাঁওতাল-মুণ্ডা পরিবার রয়েছে। ভেড়ির একপাশে। চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটে আজ কর্মচ্যুত ভুখা এই মানুষগুলোর।

ভেড়িতে জলের সরবরাহ আসে কলকাতা শহরে নিকাশী খাল মারফতে। সমতা বজায় থাকে ভেড়ির জলস্তরের। সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার ফলে নেমে যেতে থাকে জলস্তর। মাছের বদলে রায়ভেড়িতে শুরু হয় (১৯৬৭) ধানচাষ। এর পর জমিমাফিয়াদের কারুকৌশলে ক্রমশ ডাঙা জেগে উঠতে থাকে। দৃষ্টি পড়ে ডেভেলপারদের। সুরু হয়ে যায় জমির রূপান্তরপ্রক্রিয়া। লক্ষ্য নির্মাণ ব্যবসাদারী। চরিত্রপবিরর্তন করে ভেড়ির জমিতে আবাসন নির্মানপ্রয়াসে বাধা দিতে উদ্যত হয় জীবিকা হারানো মানুষগুলো। বর্গাপ্রমাণপত্র ছিল তাদের হাতে। স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জমি ঘিরে ফেলে পুলিশ পিকেট বসানো হয়। জমিতে ঢুকতে গিয়ে মার খায় পুলিশের হাতে। গুঁড়িয়ে যায় প্রতিরোধ। পুলিশ প্রহরায় শুরু হয়ে যায় এন.আর. আই. কম্প্লেকস্-এর কনস্ট্রাকশন (২০০৪)।

অথচ কলকাতা শহরের পত্তনের পর থেকে এই জলাভূমি কলকাতা শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে পারস্পরিক জৈবসম্পর্কের সূত্র ধরে। পূর্বকলকাতার এই জলাভূমির অবস্থান কলকাতা শহরবাসী মানুষের প্রাণদায়ী শক্তিরূপে। গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান কলকাতাবাসীর ফুসফুস সক্রিয় রাখতে জলাভূমির দান মাথাপিছু ১২ কেজি বিশুদ্ধ বায়ু (গ্রীন আর্থ, মার্চ, ১৯৯৬) প্রতি হেক্টর জলা প্রতিদিন ২৩৭ কেজি বি.ও.ডি কমাতে পারে (ঘোষ, ১৯৯৯)। জলাভূমির এক গ্রাম অ্যাল্গা (alga) ১.২৫ গ্রাম অক্সিজেন দেয়। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা সাইক্লোনের গতিপরিবর্তনে জলাভূমির ভূমিকাও কম নয়। অভ্যন্তরীন জলস্তর বজায় রাখে জলাভূমি। জলাভূমি ধ্বংস হওয়ার ফলে কলকাতার জলস্তর নেমে গেছে ২ থেকে ৫ মিটার। কলকাতা শহরের দূষিত বর্জ্য শোধন করতো যে জলাভূমি তা ধ্বংস হওয়ার ফলে দূষিত হয়েছে কলকাতার জলবায়ু। জলাভূমি শুকিয়ে ফেলায় বিপর্য্যস্ত হয়েছে শহরের নিকাশী ব্যবস্থা। ফলে বর্ষায় ভেসে যায় শহর। প্রাদুর্ভাব ঘটে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কলেরা, হেপাটাইটিস-ই-এর মতো মারণব্যাধি। জলাভূমি ধ্বংসের সঙ্গে হারিয়ে গেছে জীববৈচিত্র্য, বিপন্ন ইকো-সিস্টেম্। জীবিকা হারিয়েছে স্থানীয় মানুষ, বেড়েছে অপরাধ প্রবণতা।

রায়ভেড়িতে নির্মীয়মান বিলাসী বহুতল আবাসনতলে চাপা পড়ে শ্বাসরূদ্ধ অবস্থা আজ এই ভেড়িতে বংশানুক্রমে কর্মরত মানুষদের। জীবিকাচ্যুত এই মানুষদের কনস্ট্রাকশনে মজুরী পাওয়া দূরস্থান, ভেড়ির জমিতে আজ তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মৎস্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ভেড়ির পাড়ে পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী এই মানুষগুলোর রক্তে মিশে আছে মাছচাষ। রাতে ভেড়ি পাহারা দেওয়া, ভোররাতে মাছধরা আর সকালে বিভিন্ন বাজারে মাছের যোগান দেওয়া ছিল তাদের নিত্যকর্ম।

সেই সঙ্গে সারা বছর ধরে মৎস্য প্রতিপালন - সুবক্ষিত অবস্থায় তাদের পোষণ ও বৃদ্ধিসাধন। মাছচাষের প্রক্রিয়াপ্রকরণ প্রতিফলিত এদের জীবনধারায়। এই বিশেষ শিল্পে ওস্তাদ মানুষগুলো তাই ভাবতেই পারে না অন্য কোনো জীববিকার কথা। আজ তারা তাই সম্পূর্ণ বেকার। দিন কাটায় অর্ধাহারে অনাহারে। টালির ছাউনি বাঁশের বেড়ার ঝুপড়িতে সময় বয়ে যায় অনশনক্লিষ্ট হতাশ মানুষগুলোর।

মুণ্ডাপাড়ায় তাদের এই ঝুপড়ি গুলোর ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে তিনতলা - চারতলা পাকা বাড়ি বড়লোকদের। এদের চাপে একদিন গুঁড়িয়ে যাবে ঝুপড়িগুলো। সেদিন ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হবে এদের ফুটপাতে। সেদিন হয়তো খুব বিলম্বিত নয়।

মুণ্ডাপাড়ার 'গাঁওবুড়া' অশীতিপর বৃদ্ধ বলরাম মুণ্ডা। তাঁর ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন সব্জি বিক্রি করে, কেউ ভ্যান্ রিকস চালিয়ে কিছুটা রোজগার করে আনে। তিনি নিজে বুড়ো মানুষ - মাথায় বোঝা নিয়ে সব্জি বিক্রি বা ভ্যান রিকস টানার শক্তি নেই তাঁর। হতাশদৃষ্টিতে টিনের বেড়ার আড়ালে ঢাকা তাঁদের প্রিয় সেই ভেড়ির জমিটাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, — তাকাই আছি উইদিকে। বাড়ি উইঠবে, বাবুরা আইসবে। বাবুদের বাড়িতে বউবিটির ঝিগিরি মিললে দুইটা খাইতে পাব।'

রায়ভেড়ির জমি সবটাই পূর্বকলকাতা জলাভূমির অন্তর্ভুক্ত। পূর্বকলকাতার এই জলাভূমি আবার রামসার কনভেনশান (১৯৭১) অনুসারে 'রামসার সাইট' রূপে নির্ধারিত (নভেম্বর, ২০০২)। 'রামসার সাইট' হিসেবে স্বীকৃত এই জলাভূমির চরিত্রবদল নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, ইষ্টক্যালকাটা ওয়েটল্যাণ্ডস্ (কনজারভেশন এ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট) এ্যাক্ট, ওয়েষ্টবেঙ্গল ফিসারিজ এ্যাকট, ওয়েষ্টবেঙ্গল টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট) এ্যাকট, এন্ভয়রণমেন্ট (প্রোটেকশান) এ্যাকট, ওয়াটার পলিউসান (প্রিভেনসান এ্যাণ্ড কন্ট্রোল) এ্যাকট এবং কলকাতা হাইকোর্টের রায় (১৯৯২) অনুযায়ী জলাভূমি অন্তর্ভুক্ত জমির চরিত্র পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে আইন বিরুদ্ধ - অতএব নিষিদ্ধ। এসব নিষেধ-বিধি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে পুলিশ লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সরকারী দল শিল্পপতিদের সঙ্গে নিয়ে বিত্তবানদের জন্য মহার্ঘ আবাসন গড়ে তুলছে।

পাঁচ বছর ব্যবধানে মুণ্ডাপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল সুরু হয়ে গেছে রায়ভেড়ির জমির উপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও টোডিগ্রুপের যৌথপ্রয়াসে নির্মাণ প্রক্রিয়া। আর্থমুভার ক্রেণের কর্কশ আওয়াজে চাপা পড়ে গেছে বেকার মানুষগুলোর কান্না। মুণ্ডাপাড়ার মানুষদের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। শোনা গেল ওই জমিতে ফ্ল্যাট তৈরী হয়ে সেখানে বসবাসকারীদের আসতে আরো কয়েকবছর সময় লাগবে। বৃদ্ধ বলরাম মুণ্ডার দুটো খেতে পাওয়ার শেষ আশাও হয়তো অপূর্ণ থেকে যাবে।

এতোগুলো নিরপরাধ অসহায় মানুষের অনিবার্য মৃত্যুর জন্য দায়ী দেশের সরকার - অবাক লাগে ভাবতে। জীবিকা কেড়ে নেওয়া মানুষগুলোর আর্থিক পুনর্বাসনের দায় অবশ্যই সরকারের। কিন্তু রক্ষক যেখানে ভক্ষক সেখানে নির্ভরস্থল একমাত্র বিবেকবান মানুষ, হিঁতেষি প্রতিষ্ঠান। বিনম্র আবেদন, মুণ্ডাপাড়ার এই আশাহীন নিরন্ন মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হোক এদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ঘোষ, ডি. ১৯৯৯. ওয়েষ্ট ওয়াটার ইউটিলাইজেশন ইন ইষ্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যাণ্ড। ইউ. এন্. ডি. পি. অকেসনাল পেপার।
২। গ্রীন আর্থ জার্নাল, ১৯৯৬. এ্যান এনভায়রণমেন্টাল নিউজ ম্যাগাজিন, কলকাতা।
৩। দাস. উজ্জয়িনী, ২০০৬, প্রিক্কেজ অফ্ ইষ্টকোলকাতা ওয়েটল্যান্ড এ্যাণ্ড সাস্টেনিবিলিটি অফ দ্য সিটি (অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র) ডিপার্টমেন্ট অফ্ জিওগ্রাফি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে
সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা **কালধ্বনি**
যোগাযোগ ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ টেলি : ৩০৯৪ ৬৪৪০
e-mail : kalodhvani@yahoo.co.in

বাঁকুড়ার গ্রামে ''আমাদের হাসপাতাল'' ও সাম্প্রতিক কিউবার কৃষি ও চিকিৎসাশিক্ষার বৈপ্লবিক সাফল্য

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

[শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জনমুখী ও স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যতিক্রমী মানুষ বিকল্প সন্ধান ও নির্মাণে ব্রতী হয়। সেটাই ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা। এই নিবন্ধ এবং পরবর্তী আরও দুটি নিবন্ধ সেরকমই উদাহরণ তুলে ধরেছে। —সঃ মঃ]

মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তেঘরি অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফুলবেড়িয়া গ্রামে গড়ে উঠছে ''আমাদের হাসপাতাল''। প্রায় উনিশ বিঘে জমিতে গড়ে উঠছে হাসপাতাল কমপ্লেক্স। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সড়কের উপর ভগবানপুর বাস স্টপেজে নেমে সাড়ে তিন কিমি দূরে গ্রাম্যপথে গেলে ফুলবেড়িয়া গ্রাম। হাসপাতালের উদ্বোধন ১৯ অক্টোবর ২০০৮। পুরুলিয়া - বাঁকুড়া - বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে আমার পরিকল্পিত মেডিকেল জিওলজির ফ্লোরোসিসের উপর পুস্তক রচনার উপাদান সংগ্রহ করছিলাম তিন সপ্তাহ ধরে। বাঁকুড়ার জনস্বাস্থ্য দপ্তর থেকে তথ্যাবলী সংগ্রহ করে ভাবলাম পুরনো বন্ধু ডাঃ পীযুষকান্তি সরকার বাঁকুড়ার গ্রামে কি করছেন দেখেই আসি। সরকার সাহেব সেসব বিষয়ে আমাকে কখনো বিশেষ কিছুই বলেননি। মোবাইল ফোনের সাহায্যে সহজেই যোগাযোগ হল। আমার ইচ্ছার কথা শুনে বললেন : ''আইসেন। বাঁকুড়া রেল স্টেশন থেকে ২৫ কিমি দূরে ভগবানপুর বাস স্টপেজে নাইমা দাঁড়াইয়া থাকবেন। আমি শ্যাম নামে একজনকে মোটর সাইকেল দিয়ে পাঠামু। সে আপনারে লইয়া আইব।'' নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ''আমাদের হাসপাতাল''-এ আপরাহ্ন তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় পৌঁছলাম। তখনও তাঁদের দ্বিপ্রাহরিক আহার হয়নি। সরকার দম্পতির সাথে আমিও খেলাম। মোটা চালের ভাত, ডাল, তরকারি। ওখানে, পরে শুনেছিলাম, মাছ পাওয়া যায় না। থাকার ব্যবস্থা তাঁর নিজস্ব পাকা বাড়ীতে। অতিথিঘরে দু'দিন দুরাত ছিলাম। খাবার খেতাম তাঁদের সাথে। তাঁদের খাবারও আসত ১৪ জনের কমিউনিটি কিচেন থেকে। আমার নিজের বাড়ীতে থাকা-খাওয়ার মান অনেক ভাল। পীযুষবাবুর কলকাতার বাড়ীতেও তাই। কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা ও উদারতায় আমার দু'দিনের ফুলবেড়ের ছুটী চিরকাল সুখ-স্মৃতি হয়েই থাকবে।

পীযুষবাবুর নিজস্ব বাড়ী ১১০০ বর্গফুটের। বাড়ীর সামনে উঠোন-কাম-সবজি বাগান। সেখানে ফুলকপি, টমাটো, পালংশাক ও অন্যান্য সবজি হয়েছে। পিছনে দুটি পেঁপে গাছে ফলেছে অনেক পেঁপে। সামনের ক্ষেতে গাঁদাফুল, গোলাপ ও অন্যান্য ফুল। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড সৌরকিরণ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি সবুজ ঘরের পরিকল্পনা করছেন। এখানকার 'তাঁড়' জমিতে (জলহীন, অনুর্বর) যে সুন্দর ফসল হতে পারে তা এখানকার লোকেদের কাছেও বিস্ময়।

বিগত বৎসরাধিক কাল ধরে চলছে হাসপাতালের বহির্বিভাগ বা আউটডোর। সেখানে আছে প্যাথলজি ল্যাব। ডিপ্লোমাধারী একজন প্যাথলজিস্ট তার দায়িত্বে। একজন কম্পাউণ্ডার আছে, আছে একজন কেরাণীর মতন কর্মী যে রোগীদের নাম-ঠিকানা, অসুখ-বিসুখের বিবরণ, পারিবারিক ইতিহাস, ব্লাড প্রেসার, ওজন ইত্যাদি লিখে রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠান। রোগীদের রসিদ নিয়ে ১০ টাকা ফি জমা দিয়ে আউটডোরের পাকা বেঞ্চিতে অপেক্ষা করতে হয়। প্রতিদিন বিশ-পঞ্চাশ জন রোগী আসে। এক বছরেই হাসপাতালের সুনাম এতটাই হয়েছে যে বাঁকুড়া হাসপাতালে না গিয়ে অনেক কষ্ট করেও এতদূরে রোগী আসছে। ডাক্তার একজনই: ডাঃ পীযুষকান্তি সরকার, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন অধিকর্তা ও মেডিকেল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন রেজিস্ট্রার। সকাল ৮ টা থেকে দুপুর দুটো - তিনটে পর্যন্ত্য রোগী দেখেন। তারপর দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আবার বিকেল পাঁচটা থেকে। রবিবার ছুটি। পীযুষবাবুকে চাষবাসের তদারকি ছাড়াও হাসপাতালের ইট কাঠ বালি লোহা মিস্ত্রী সবেরই ব্যবস্থাপনা করতে হয়। রাস্তায় আলো নেই। তবে ভারত সরকারের বিদ্যুতের লাইন আছে। জলের জন্য ইদারা বসানো হয়েছে। সেখান থেকে পাম্প করে পীযুষবাবুর বাড়ীতে ও হাসপাতালে জল সরবরাহ করা হয়। ডাঃ সরকার ও তাঁর স্ত্রী (প্রাক্তন সেবিকা ও সেবিকা শিক্ষয়িত্রী) এর অবসরান্তের প্রাপ্ত অর্থেই হাসাপাতল কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত আছেন কিছু ডাক্তার, চিকিৎসাকর্মী, অডাক্তার সাধারণ মানুষ এবং শ্রমজীবী স্বাস্থোদ্যোগ। এই কর্মোদ্যোগে ডাঃ সরকারের কিছু বন্ধুবান্ধব, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী ছাড়া দেশী বিদেশী আর কোন সংস্থার কোন অর্থসাহায্যই নেওয়া হয় না। এই কর্মোদ্যোগের জন্য প্রতিষ্ঠিত "ফাউণ্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন" এর মুখপাত্র 'অসুখ-বিসুখ" পত্রিকায় (দ্বিমাসিক) কোনরকম বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না।

কাজ করার জন্য এই অঞ্চল নির্বাচনের অন্যতম কারণ হ'ল এখানে জমির দাম কম। এখানে মানুষের চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রয়োজনও বেশী। নিকটবর্তী কালাপাথরে একটি নবোদয় বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। আদিবাসী অঞ্চলে হাসপাতাল করলে ভারত সরকারের ভাল আর্থিক অনুদান পাওয়া সম্ভব। "আমাদের হাসপাতালে" "ইনডোর" বা অন্তর্বিভাগ খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। তার মূল পরিকল্পনা আমার মনে হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের ডিগ্রী-ডিপ্লোমাহীন ডাক্তার ও আগ্রহী বুদ্ধিমান তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যোগ্য পারিবারিক চিকিৎসক তৈরি করা। তার জন্য তৈরি হচ্ছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ছাত্রাবাস ও কর্মী আবাসন। তাঁর একজন ডাক্তার ছাত্র একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান দিয়েছেন। আর একজন দিয়েছেন একটি এক্সরে মেশিন (এখনও চালু হয় নি)। চিকিৎসা-সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিমাসিক পত্রিকা "অসুখ-বিসুখ" চলছে গত ৯ বছর ধরে। সম্পাদক : ডাঃ পীযুষকান্তি সরকার; সহসম্পাদক - ডাঃ পূণ্যব্রত গুণ। কলকাতার ঠিকানা - 'বোধি অফিস', ২৫৪ লেকটাউন, বি-ব্লক, কলকাতা - ৭০০০৮৯। তাঁদের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য : "অসুখ-বিসুখের কারণ এবং তার চিকিৎসা সম্বন্ধে কাজ চলার মত জ্ঞান থাকলে অডাক্তার মানুষও একদিকে যেমন নিজের বা পরিবারের বেশকিছু অসুখ বিসুখের ঘটনা কমিয়ে আনতে পারেন, অন্যদিকে তাঁরা রোগের চিকিৎসাতেও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে একজন পাশকরা ডাক্তার যতটা জানেন একজন চিকিৎসা কর্মী বা অডাক্তার মানুষ ততটাই জানবেন এটা যেমন আশা করা যায় না, তেমনি কেবলমাত্র ডাক্তাররাই জানবেন, অন্যেরা অজ্ঞ থাকবেন, এটাও মেনে

নেওয়া যায় না। ডাক্তার ছাড়াও রোগের চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য চিকিৎসা কর্মীদের ওষুধ, রোগ এবং তার চিকিৎসার বিষয়ে দরকারি তথ্য জানানোর উদ্দেশ্যেই অসুখ-বিসুখ পত্রিকা।"

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামাঞ্চলের এল.এম.এফ. ডাক্তাররাই সব রকম চিকিৎসা সাফল্যের সঙ্গেই করতেন। তাঁরা গ্রামেই থাকতেন, অনেকে শহরেও প্র্যাকটিস্ করতেন। তাঁরা গ্রামের মানুষদের শ্রদ্ধেয় আপনজন হয়েই থাকতেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের প্রথম দিকে যখন আবার ডিপ্লোমা কোর্স ('বেয়ার ফুট ডক্টরস') প্রবর্তনের চেষ্টা হ'ল, তাতে সংঙ্ঘবদ্ধ উচ্চ ডিগ্রীধারী চিকিৎসক সংগঠন কেমন বিরোধীতা করে সরকারের সেই জনমুখী শুভ উদ্যোগকে বানচাল করেছিলেন, তা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। জ্যোতি বসু বড় ডাক্তারদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। বাঁকুড়ার গ্রামে বর্তমানে যে "আমাদের হাসপাতাল" এর সূচনা, যেখানে চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখান থেকে পাসকরা ছেলে মেয়েরা সরকারী স্বীকৃতি বা সরকারি চাকরি হয়তো পাবেন না, কিন্তু তাঁদের বর্ধিত জ্ঞান ও সেবা দিয়ে মানুষের আপন জন হয়ে উঠবেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এবারে দেখা যাক এই প্রতিবেদনে হঠাৎ বহু দূরের কিউবার কথা কেন ওঠানো হচ্ছে। কিউবা ছোট সমাজতান্ত্রিক দেশ। তার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ, ফিদেল ক্যাস্ত্রো যার প্রধান ছিলেন, অর্ধশতাব্দী আগে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কিউবায় একধরণের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। কিউবা আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাধরণের বৈরীতা, অবরোধ নিষ্ক্রিয় করে স্বাধীনভাবে টিকে থাকার জন্য নানারকম সাহায্য ও সুযোগ দিয়ে এসেছে যারা, সেই সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশ সমূহের কমিউনিষ্ট শাসনের পতনের পর কিউবার রপ্তানি বানিজ্য (প্রধানত চিনি, তামাক, ধাতব আকরিক) বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আমদানিও যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পেট্রোলিয়াম, কৃষি রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। আমেরিকার অর্থনৈতিক আংশিক অবরোধ ও আমদানি - রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিউবার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশে খাদ্যাভাব ও বেকারি বাড়ে। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়লেও বেশিরভাগ জনসাধারণ কিউবার বিপ্লবী নেতৃত্বের উপর আস্থা ও আনুগত্য বজায় রেখে সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে যান। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মহান আদর্শ, আত্মপ্রত্যয় ও মানবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ কিউবানরা দুটি বিষয়ে যে চমৎকার সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন তাতে তাঁদের সংকট কেটেছে। তাঁরা নাগর জৈব কৃষি কর্মে ও জনমুখী চিকিৎসা শিক্ষায় যে অভাবনীয় উন্নতি করেছেন তা বিশ্ববাসীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

৯০এর দশকের "বিশেষ কালে" (special period) প্রথম বড় বিজয় নাগর জৈব কৃষি বিপ্লব (Urban Organic Revoulution)। কিউবার সওয়াকোটি মানুষের প্রায় ৭২ শতাংশ শহরে বাস করে। পেট্রোল আমদানি নেই। তাই ট্রাক্টর প্রভৃতি সরিয়ে রেখে সাবেকি লাঙল-বলদ ফিরিয়ে আনা হয়। রাসায়নিক সারের বদলে জৈবসারের প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানো হয়। ছোট খামার বাড়ে। রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের বদলে পেষ্টের জীব নিয়ন্ত্রণ (বায়োলজিক্যাল পেষ্ট কন্ট্রোল) ও কৃষি ক্ষেত্রে মিশ্র চাষ ও জমির স্বাস্থ্যবিধি (সয়েল হাইজিন) ভালো করার দিকে নজর বাড়ানো হয়। উৎপাদন খুব বাড়ে, বাড়ে মানুষের পুষ্টি। কৃষিকর্মের সাথে

বিক্রি করতে পারে। তাতে বড় বড় উৎপাদকের একচ্ছত্র অধিকার খর্ব হবে। এ কারণে স্থানীয়ভাবে বায়ু, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে। বয়লারে যৌথভাবে বিদ্যুৎ ও তাপ দু-ই উৎপাদিত হচ্ছে।

আঠেরোশো খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে থমাস এডিসন যখন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন সে সময়ে তাপ ও বিদ্যুৎ দু-ই যৌথভাবে উৎপাদন করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। আত্মনির্ভরশীল গৃহস্থালীতে উৎপাদনের জন্য কি ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রয়োজন তার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে জর্জ ওয়াশিংটনের স্বপ্ন অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এবং বৈদ্যুতিক তার ও ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে বিরাট অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগান শুরু হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে বিদ্যুতের কর্মক্ষমতা কমে। বৈদ্যুতিক তারে রোধের (resistance) জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ নষ্ট হয়। এতদিন উষ্ণায়ন নিয়ে কথা ওঠেনি এবং জীবাশ্ম জ্বালানি সস্তা ছিল।

এখন অবস্থা বদলাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হলো তার কর্মক্ষমতা বেশি। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির শতকরা ৩০ ভাগ শক্তি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে, বাকি শক্তি তাপ হিসাবে পরিবেশে এবং শীতক জলের মাধ্যমে নষ্ট হয়। যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তার শতকরা ৭ ভাগ সংবহন লাইনে নষ্ট হয়। নতুন ধরনের বৈদ্যুতিক কেন্দ্র এই অপচয় শতকরা ৪৫ ভাগ কমিয়ে দিতে পারে এমনকি জীবাশ্ম জ্বালানির সাহায্যে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও বর্জ্য তাপ জল কিংবা ঘর গরম করার জন্য ব্যবহার করা যায়। কর্মক্ষমতা যদি শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা যায় তাহলে জ্বালানির ব্যবহার দুই তৃতীয়াংশ কমে, কার্বন নিঃসরণ একই হারে কমে। বেশি কার্যক্ষম যন্ত্রপাতি, অপচয়রোধক ব্যবস্থা এবং স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে গৃহস্থালী ও বাণিজ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদনের জন্য অনেক কম জ্বালানির প্রয়োজন হবে।

স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় দৃষ্টান্ত হল ডেনমার্ক, শক্তির কর্মক্ষমতায় তারা পৃথিবীতে প্রথম। অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সে দেশে খুবই কম। ৮০'র দশক থেকে সেখানে স্থানীয়ভাবে তাপ ও বিদ্যুৎ একই সাথে উৎপাদন শুরু হয়। ৯০ এর দশকে ডেনমার্কেই ফিড ইন টারিফ চালু হয়। তাতে স্থানীয়ভাবে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসাহিত হয়। আজ সেদেশে মোট বিদ্যুতের এক তৃতীয়াংশের কম উৎপাদন করে বড় পরিষেবা। পৃথিবীর যে কোনও দেশের তুলনায় ডেনমার্ক প্রতি ডলার গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP) উৎপাদনে সব চেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে।

ধীরে ধীরে অন্য দেশের সরকার তাদের অনুসরণ করছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে জার্মানিতে ফিড-ইন-টারিফ চালু হয়। জার্মানি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে আজ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ৩ বছরে (২০০৫-২০০৭) চার লক্ষ পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৩ হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যোগ করেছে। সে দেশের সৌর কোষ ও সৌর তাপ সংগ্রাহকের বাজারই ২০০৮ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ছিল। পিছনে রয়েছে জাপান ও স্পেন। তারাও ফিড-ইন-টারিফ চালু করেছে।

কর ছাড় ও ভর্তুকির মাধ্যমেই এই সব কর্মসূচী ব্যাপকভাবে চালু হয়। সৌর কোষের বাজার বেড়েছে। ফলে উদ্যোগপতিরা চেষ্টা করছেন, ২০১০ সালের মধ্যে দামের দিক থেকে প্রথাগত বিদ্যুতের সঙ্গে তা প্রতিযোগি হয়ে ওঠে। যে নতুন সৌর কোষ স্থাপিত হচ্ছে তার বেশিরভাগই সরাসরি গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ করা হচ্ছে।

অবশ্য তা খুব সহজে হয়নি। বড় বড় পরিষেবা এ কাজে নানাভাবে বাধা দিয়েছে, প্রযুক্তিগত জটিলতাও ছিল। বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোনওটা হিসাব করে বন্ধ রাখা যায়। কিন্তু অসংখ্য স্থানীয় উৎপাদক যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যে কোনও মুহূর্তের চাহিদার সাথে তার মিল থাকে না।

নতুন প্রযুক্তিতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে গ্রিড দেশের সীমা ছাড়িয়েছে। ডেনমার্কে যখন বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে নরওয়ের জলবিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একই ধরনের ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। স্থানীয়ভাবে সূর্য, বায়ু ও জৈব ভর বিদ্যুৎ উৎপাদকের উৎপাদনের হিসাব রাখতে ইন্টারনেটের সাহায্যে একটি পরিষেবা চালু করা যায় কিনা তার পরীক্ষা চলছে। লক্ষ্য, যেন চাহিদা মতো বিদ্যুতের যোগান ঠিক রাখা যায়।

ডেনমার্কে এনার্জি নেট কোম্পানি স্মার্ট মিটার চালু করেছে। কখন বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে, সৌর কিরণ আছে কিনা, বাতাস বইছে কিনা তার ওপর বিদ্যুতের দাম নির্ভর

করবে। কেন্দ্রীয় পরিষেবার ওপর নির্ভর না করে গ্রিড ওই মিটারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে এনার্জি ইন্টারনেট। বিকেন্দ্রিত স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থার দিকে যাওয়া অ্যানালগ ব্যবস্থা থেকে ডিজিটাল ব্যবস্থার যাওয়ার সাথে তুলনীয়। বড় বড় উৎপাদকরা অবশ্য সহজে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে না। বেশিরভাগ ফরাসি ও জার্মান পরিষেবা তাদের গ্রিড ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকে জায়গা দিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সংবহন লাইন দুই এরই মালিক এই সব বড় বড় পরিষেবা, তারা নিজেদের বিদ্যুৎ বিক্রিতেই বেশী আগ্রহী। সে কারণেই ইউরোপীয়ান কমিশন তার সদস্য দেশকে গ্রিড ব্যবস্থা চালু করার জন্য স্বতন্ত্র কোম্পানি খুলতে বলছে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় তা করাও হয়েছে।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানির সবচেয়ে বড় পরিষেবা এয়ন ঘোষণা করেছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথামতো তারা তাদের হাই ভোল্টেজ গ্রিড সবার জন্য খুলে দেবে। জার্মানির বশ এবং নিউজিল্যান্ডের হুইশপারজেন কোম্পানি গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত কার্যক্ষম মাইক্রো-কোজেনারেশন ইউনিট বাজারে এনেছে। এই ইউনিটগুলো তাপ ও গরম জল উৎপাদনে যেমন বয়লারের মতো কাজ করে তেমনি বিদ্যুৎ উৎপাদনও করে যা তারা গ্রিডের মাধ্যমে বেচতেও পারে। এভাবে গৃহস্থালীতে বিদ্যুতের খরচ শতকরা ২০ ভাগ কমানো যায়। এই বয়লার গ্যাস চালিত বলে কিছু কিছু গ্যাস পরিষেবা তা বন্টনের কাজে এগিয়ে এসেছে।

স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে। কোন্য কোনও অঞ্চলে বায়োগ্যাস উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদিত গ্যাস দেশের গ্যাস পাইপের নেটওযার্কে চালান করতে চাইছে। জার্মানির আচেন শহর ভুট্টা ও রাই থেকে উৎপাদিত জৈব গ্যাস শহরের গ্যাস নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ভুট্টা থেকে উৎপাদিত ইথানলের চেয়ে জৈব গ্যাস উৎপাদন করে তারা অনেক বেশি লাভ করেছে। এই গ্যাস ৫ হাজার গৃহস্থালীর ব্যাবহারের জন্য যথেষ্ট। ফলে সেখানে সাইবেরিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। ইউরোপের অন্যান্য শহরেও এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। জার্মান পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের চেষ্টাও চলছে যাতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বায়ো গ্যাস গ্যাসপাইপলাইন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করাযায়। আমেরিকাতেও স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। টেক্সাসে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর ছাড় থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ায় মিলিয়ন সোলার রুফ্স কর্মসূচিই তার প্রমাণ।

তবে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের বাজার সবচেয়ে বড় হল উন্নয়নশীল দেশে। ভারত, চিন ও আফ্রিকার বহু গ্রামে গ্রিড নেটওয়ার্ক হয় নেই কিংবা ব্যবস্থা উন্নত নয়। স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সংবহন লাইন তৈরীর জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ শুরু হবে। ২০০৮ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করেছে যে গ্রামাঞ্চলে জৈব ভর ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদকদের বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে। ২০০৯ সালে চিন সবচেয়ে বেশি সৌর কোষ নির্মাতা হিসাবে জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাবে। চিন উৎপাদন করছে পশ্চিমী দেশে রপ্তানির জন্য। বাজারে চিনের প্রবেশে অনেকেই আশা করছেন যে সৌরকোষের দাম কমবে।

ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমালোচকেরা বর্তমান প্রযুক্তির বেশি খরচের কথা বলেন। বায়ু বিদ্যুৎ ছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বেশিরভাগ বিদ্যুৎই দামের দিক থেকে বেশি। তবু যে তার ব্যাপক বৃদ্ধি হচ্ছে তার মূল কারণ কর ছাড়, ফিড-ইন-টারিফ এবং বিকল্প শক্তি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা। জার্মানির গ্রাহক ও করদাতারা স্থানীয় ও বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদকদের ভর্তুকি হিসাবে বছরে ৬২০ কোটি (৬.২ বিলিয়ন) ডলার খরচ করেন।

শুরুর দিকে বাজার তৈরী করতে সুবিধাজনক আইন ও ভর্তুকি প্রয়োজন। উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের দাম কমবে, ভর্তুকি তুলে নেওয়া যাবে, আমদানি নির্ভর থাকতে হবে না। তাছাড়া কার্বন নিঃসরণ যে ঘটবে না তার হিসেব নিতে হবে। পৃথিবীর বড় বড় পরিষেবার জন্য বছরে ভর্তুকি হিসাবে ৩০ বিলিয়ন (৩০ হাজার কোটি) ডলার ব্যয় করা হয়। এছাড়া IEA-র হিসাবে ২০৩০ সালের মধ্যে সংবহন, পরিকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিকিরণের জন্য ২২ ট্রিলিয়ন (২২ লক্ষ কোটি) ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে না। ফ্রিয়ন্ত-এর মতো শত শত ছোট ছোট অঞ্চল পৃথিবীময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও তা বৃদ্ধি করে চলেছে বিদ্যুৎ গ্রিডের ওপর নির্ভর না করেই।

ছেয়ে ফেলে? যদি একটা হিরোসিমার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ঘটে যায়?

আসল ঘটনা হলো এই সমস্ত সম্ভাবনাই বাস্তব সম্ভবনা এবং এর যে কোনও একটা ঘটার জন্য কোনো কল্পিত, নামাজ-পড়া, চুলদাড়ি-ওয়ালা অন্তর্ঘাতকের প্রয়োজন নেই। নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তিটাই অতিরিক্ত দুর্ঘটনা-প্রবণ, সামান্য মনুষ্যজনোচিত ভুলের মাশুল দিতে হয় মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির মারফৎ। কর্মীদের পক্ষ থেকে সামান্য ভুলের জন্য জাপানে টোকাইমুরা চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভারতে এমন ঘটনা তারাপুর চুল্লিতে ঘটেছে একাধিকবার। নারোরা তে ঘটেছে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। অথচ ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের নবীন মেহের আলি বৃন্দ সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং বিচার ধারাকে উড়িয়ে দিয়ে গলার শির ফুলিয়ে বলে চলেছেন নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের বিপক্ষে বিজ্ঞানীদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং অর্থনীতিবিদদের সমস্ত অর্থনৈতিক যুক্তি "সব ঝুটা হ্যায়"। নিউক্লিয়ার বিষয়ে তাঁদের ব্যর্থতার "সচ্ বাত' তাঁরা কবে প্রকাশ্যে বলার বৈজ্ঞানিক সততা দেখাবেন? শু. মু.

দুই

কোপেনহেগেন - কিয়োটা - অতঃ কিম

২০০৫-এ কিয়োটো বিধি বলবৎ হওয়ার পর মার্কিণ দেশ তা নিয়ে প্রথমে সরব হয় অন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক বিধির মতো তারা কিয়োটো বিধি থেকেও সরে আসে। তারা সাধু সেজে তাদের জন্য কার্বন নির্গম কমানোর একটা মাত্রা নির্দিষ্ট করে - বলাই বাহুল্য সেই নির্দিষ্ট মাত্রা, কিয়োটো বিধি মোতাবিক তাদের যতটা কার্বন নির্গমন কমাতে হতো তার চেয়ে ঢের কম। কিয়োটো বিধি মোটেই কোন বিপ্লবী নিদান দেয়নি -কিন্তু শিল্পঘন দেশগুলো এমনকি সেই অতিরিক্ত শিথিল বিধি মানতেও দ্বিধা দেখিয়েছে। দূষণ নিয়ে ব্যবসা করার তাগিদে তারা কিয়োটো বিধির সঙ্গে কার্বন-বাণিজ্য জুড়েছে। এর ফল হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর (যাদের কে আদর করে মার্কিণ দেশসহ শিল্পঘন দেশগুলো নাম দিয়েছে "তালিকা বর্হিভূত দেশসমূহ") পক্ষে বিষময়। কার্বন বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে অন্যায্য মুনাফা করার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে এই শিল্পঘন দেশগুলো তাদের কার্বন নির্গমন পরিমাণ 'কমিয়েছে'। পরিমানটা হলো তারা ১৯৯০ সালে যে পরিমাণে কার্বন নির্গমন করেছিলো, ২০০৬ এ এসে দেখা গেলো, তাদের নির্গমনের হলো প্রায় ৫ শতাংশ কম। কিন্তু ১৯৯০ থেকে ২০০৪, এই সময়সীমায় সারা বিশ্বে উষ্ণতাবর্ধক গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২৪ শতাংশ - অর্থাৎ বর্ধিত এই পরিমাণের সবটাই প্রায় নির্গমন করেছে ঐ তথাকথিত "তালিকা বর্হিভূর্ত দেশসমূহ"! মজাটা হয়েছে ভালোই - আমার উঠানের আবর্জনা আমি পড়শীর উঠোনে চালান করছি পড়শী দিয়েই, আর তার জন্য পড়শী তার রোজগারের কড়ি আমাকে গুণে দিচ্ছে।

আজকে ইউরোপের যে অংশটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তার অধিকাংশ দেশের সঙ্গে মার্কিণ দেশের বিরোধ-এর কথা সুবিদিত। ফলে ইউরোরা যদি পূর্বে যায় তো শ্যামু চাচা পশ্চিমে ঝুঁকে পড়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্বন নির্গমন জনিত সমস্যার সমাধানে উৎস মুখেই নির্গমন কমানোর কৌশল গ্রহণ করেছে। তারা চেয়েছে যে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্বন নির্গমনই কমিয়ে আনবে শক্তির এমন সমস্ত উৎস ব্যবহার করবে যাতে কার্বন নির্গমন ন্যুনতম হতে পারে।

মার্কিণ দেশ সব সময়েই চায় যে তাদের "জীবনযাপন প্রণালী"-র ওপর যাতে কখনই নিয়ন্ত্রণ না পড়ে। ফলে তারা গ্রহণ করেছে "অ্যাডপটেশন স্ট্র্যাটেজি" - অর্থাৎ সেই ধূমপানে ক্যানসার হলে ক্যানসারে উন্নত চিকিৎসার নিদান আর কি? ঠিক যেমন গত বছর অর্থনৈতিক দুর্বৃত্ত সংস্থাগুলো জনগণের টাকা মেরে পালিয়ে গেলে মার্কিন দেশ ভরতুকি দিয়ে সংস্থাগুলোর ঋণের বোঝা নিজের কাঁধে নিলো এবং সাধারণ করদাতা নাগরিকবৃন্দ দেউলিয়া হয়ে গেলো, অথচ এই অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে কিছুই পদক্ষেপ নেওয়া হলো না - এই হলো মার্কিন দেশের 'অ্যাডপটেশন স্ট্র্যাটেজি'।

মার্কিন দেশ যেমন বিশ্বব্যাপী সমঝোতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, তেমনি আবার এই দেশটি নিজের স্বার্থে নতুন নতুন বিশ্বজোড়া সমঝোতাও গড়ে নেয়। এখন যেমন চলছে এডস্-এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুক্তফন্ট, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুক্তফন্ট ইত্যাদি। লেখক শরৎচন্দ্র একবার একজনকে রহস্য করে বলেছিলেন যে সেই ব্যক্তির জীবে প্রেম কুকুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি, তেমনি মার্কিন দেশের 'অ্যাডপটেশন' যুদ্ধাস্ত্রের বাইরে প্রসারিত হয়নি। কিয়োটো বিধির পর মার্কিন দেশ কার্বন

নির্গমনের জন্য যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। অথচ মার্কিন প্রতিরক্ষা খাতে (পড়ুন বিশ্বজোড়া আগ্রাসন চালানোর খাতে) তার ব্যয়ের বহর বিরাট। সামান্য দুচারটে হিসেব দেওয়া যাক। ২০০৯ সালে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ৫১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সংখ্যাটা বিরাট বড় শুনতে লাগছে না কেননা এই হিসেবে লুকোনো খরচগুলো ধরা নেই। এই খরচের সঙ্গে জুড়তে হবে আপৎকালীন খরচ, যার একটা হিসেবে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৫১৮ থেকে ৬৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাসে-ট্রামে যখন দ্রব্য ফেরি করা হয় তখন বলা হয় এখানেই শেষ নয় - যে দাদা আজকে এই দুটো কিনবেন তিনি সঙ্গে পাবেন .....। মার্কিন প্রতিরক্ষার সঙ্গে রয়েছে প্রতিরক্ষার সঙ্গে জড়িত খরচাপাতি (লোকের মাইনে, সৈন্যদের বাড়িঘর তৈরী ইত্যাদি ইত্যাদি) তার পরিমান হলো ন্যুনতম ২৭৪ বিলিয়ন আর সর্বাধিক হলো ৪৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে ২০০৯ এ মার্কিন প্রতিরক্ষা ঘাতে খরচ বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ন্যুনতম ৯২৫ বিলিয়ন এবং সর্বাধিক ১.১৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। সংখ্যার পর শূন্যগুলো বসালে তাদের পিঁপড়ের সারি মনে হবে আর পরিমানটা তৃতীয় বিশ্বের কোনও কোনও দেশের দুবছরে মোট বাজেটের চেয়েও বেশি হবে।

দুনিয়ায় মার্কিন দেশকে হনুকরণ (হনুমানের মতো অনুকরণ আর কি) করার দেশের অভাব নেই - ফলে এই হনুকরনে অভ্যস্থ দেশগুলোও "প্রতিরক্ষা" খাতে ব্যয় বাড়িয়ে চলেছে, অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ মার্কিন মদতে। ২০০৮ সালে সারা পৃথিবীর সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ১.৪৬ ট্রিলিয়নের কিছু বেশি। এই পরিমানটিতে যদি দশ বছর আগের সময়ের (অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের) ব্যয়ের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি জনিত সংশোধনী সহ তুলনা করি তবে দেখবো যে তা ঐ এক দশকে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরিমান হবে প্রায় ৪৫ শতাংশ।

মার্কিন দেশ এডস্ রোগের প্রতিশেধক বানানর জন্য ৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করবে বলেছে। মার্কিন দেশে এড্স-এর টীকা বানানর হিড়িক পড়েছে- সারানর চেয়ে হলে কমানর ক্ষেত্রে কম্পানী গুলোর মুনাফার পরিমান বাড়ে। এডস্ এর মতো ছোঁয়াচে রোগগুলোর টীকা তাই কম্পানীগুলোর কাছে লাভজনক - একজনের হলে, ঘন বসতি পূর্ণ স্থানে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে দ্রুত।

পোড়া দেশ ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটাই ভিন্ন। নিমোনিয়া রোগটার কথাই ধরা যাক। এটি এড্স-এর গোত্রের ছোঁয়াছে রোগ নয় - ফলে টীকা থেকে টাকা করতে কম্পানীগুলো উৎসাহী নয়, যদিও প্রতি মিনিটে ভারতে একজন করে শিশু নিমোনিয়াতে মৃত্যু বরণ করছে - ভারতে যত শিশু মৃত্যু ঘটে তার ২০ শতাংশ ঘটে এই নিমোনিয়ার কারণেই - বছরে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু এই রোগে প্রাণত্যাগ করে। এই দিকে কিন্তু কারোরই নজর নেই কেননা এখানে মুনাফা নেই অত বেশি। এডস্-এর জন্য যেখানে ৬৩ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ সেখানে খাদ্যের জোগান সুনিশ্চিত করার জন্য বরাদ্দ মাত্র ২০ বিলিয়ন ডলার, অথচ প্রতিদিন রাতে খিদে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৬৪ কোটি জনগন ঘুমোতে যান। মুনাফার রাজ্যে পৃথিবী ক্ষুধাময়, পূর্ণিমা চাঁদ ও পেটেন্ট হওয়ার অপেক্ষায় -- ঝলসানো রুটি জোটাতে গেলে মুনাফা হঠাতে হবে। চে গুয়েভারা-র ডাক শোনার মতো কান কি প্রস্তুত? শু. মু.

তিন

জৈব আগ্রাসন

ক্রশবি সাহেব তাঁর ইকোলজিক্যাল ইমপিরিয়ালিজম গ্রন্থে বলেছেন যে দেশ দখলকারী জলদস্যুরা যেমন দখলীকৃত দেশ থেকে সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি তারা তার পরিবর্তে রেখে গেছে পরক (alien) জৈব দ্রব্য - প্রাণী এবং বীজানু। এও এক ধরনের নতুন উপনিবেশবাদ। আলেকজান্ডার বা বিভিন্ন সুলতান বংশীয়রা ভারতে এসে এই বিষয়ে কী কী কীর্তি রেখে গেছে সে বিষয়ে ইতিহাসের সঙ্গে জীবনবিজ্ঞানও নীরব। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা, ক্লাইভ, ডুপ্লে বৃন্দ কী কীর্তি রেখে গেছেন সেই সম্পর্কে অল্প অল্প করে জানা যাচ্ছে।

সাহেবদের হাত ধরে এবং তাদের সঙ্গে নানান বস্তু এদেশে এসেছে - তার মধ্যে আমরা কেবল জীবন্ত বস্তু নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। শোনা যায় আমাদের দেশের যে

হয়ে আছে, তখনও আমরা সারা দেশে ডাইঅক্সিন ছড়িয়ে 'মিনি ভিয়েতনাম' বানাচ্ছি।

এতক্ষণ তো জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কথা চললো এবার আমরা নিজেদের দিকে নজর দিই। দুঃখের কথা হলো মাতৃদুগ্ধেও মাতৃভাষার মতো এই পপ্‌স পাওয়া গেছে-সারা পৃথিবীতে, সারা ভারতে এবং এই শহর কোলকাতেও। এই বিষয়ে আমরা সাম্প্রতিকতম একটি সমীক্ষার নির্যাস আলোচনা করে থেমে যাবো। ভারতের দুটি শহর চেন্নাই এবং কলকাতায় ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত একটি বড়মাপের ক্ষেত্র সমীক্ষা হয় - সেই সমীক্ষার ফল সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্রের আকারে একটি মান্য পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধাপায় যেখানে পুরসভা জঞ্জাল ফেলে যেখানে এবং ধাপা থেকে ৩০ কিমি দূরের অঞ্চল থেকে মায়েদের কাছ থেকে দুধ নিয়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়। যতগুলো দুধের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল তার সবগুলোতে পপস্‌-এর অস্তিত্ব মিলেছে—ধাপার অঞ্চলের দুধের নমুনাতে পপস্‌-এর পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। ধাপা অঞ্চলে যে যতদিন ঐ অঞ্চলে রয়েছেন, ঐ সকলের মায়েদের দুধে এই পপস্‌ বেড়েছে তার সঙ্গে সমতা রেখেই। চেন্নাইতেও একই চিত্র, তবে চেন্নাইতে মায়ের দুধে পপ্‌স এর পরিমাণ কোলকাতার চেয়ে কম। ভারতে, বিশেষত কোলকাতায় ডাইঅক্সিন নির্গমন রোধে না আছে কোনো আইন, না আছে কোনও নজরদারীর ব্যবস্থা ফলে পপ্‌স দূষণের বিপদ ভারতে বাড়ছে। এখন শহর বাড়ছে বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়, ধাপার পুরোনো জঞ্জালের মাঠে হয়েছে এনার্জিপার্ক, বিয়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার স্থান - হই হই করে উঠছে বহুতল। ডাইঅক্সিনের টাইম বোমার সলতে কি আগুন লেগেছে, তা কি বিস্ফোরণের অপেক্ষায়?

শু. মু.

পাঁচ

ভোপালের পঁচিশ বছর ঃ নতুন আইন আনছে নতুন বিপদের আশংকা

১৯৮৪ সালের ২-৩ ডিসেম্বর ঘটেছিল বিশ্বের ভয়াবহতম রাসায়নিক বিপর্যয়। ২০০৯-এর ডিসেম্বরে ভোপালসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং অন্যান্য দেশেও নানাভাবে তাকে স্মরণ করেছে মানুষ। জানিয়েছে ভোপালের গ্যাস-পীড়িত মানুষকে সহানুভূতি ও সমবেদনা। ভারতের লোকসভাতেও সেদিন ভোপাল প্রসঙ্গ উঠেছিল। স্পীকার শ্রীমতি মীরা কুমার বলেন - পৃথিবীর কোথাও মানুষ এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার যাতে না হন তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

সরকারী কাজকর্মে কিন্তু এই অঙ্গীকারের কোন প্রতিফলন নেই। একের পর এক এমন সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যাতে দেশের সাধারণ মানুষের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বড় লগ্নীর স্বার্থ দেখার অতি আগ্রহই প্রকাশ পাচ্ছে। ভোপালের ২৫ বছর পূর্তিতে দেশবাসী পেতে চলেছে নয়া উপহার।

ন্যাশানাল গ্রিন ট্রাইবুনাল বিল (NGT) এবং নিউক্লিয়ার সিভিল লায়েবিলিটিজ বিল (NCL) -এই দুটি বিল পার্লামেন্টের চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে আইনে পরিণত হবার অপেক্ষায়।

NGT বিলের ঘোষিত উদ্দেশ্য মহৎ। পরিবেশ সংক্রান্ত মামলাগুলিকে এক বিশেষ ট্রাইবুনালের হাতে তুলে দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তি করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞরা এতে নতুন বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন। গ্রীন ট্রাইবুনাল কেবলমাত্র সেইসব অভিযোগই গ্রহণ করবে যেগুলি ''বৃহত্তর সমাজের'' ক্ষতিগ্রস্ত হবার নিরিখে ''গুরুতর''। এবং আবেদন করতে হবে ঘটনা ঘটার ছ'মাসের মধ্যে। যথেষ্ট কারণ দর্শালে অবশ্য আরও ৬০ দিন সময়সীমা বাড়তে পারে। ট্রাইবুনাল কাজ করবে সিভিল কোর্ট হিসেবে।

প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যে অভিযোগ 'গুরুতর' কিনা, বৃহত্তর সমাজের ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি না, থাকলে কতটা তা চূড়ান্তভাবে স্থির করবে ট্রাইবুনাল। বাড়তি সময় চাওয়ার ক্ষেত্রে দর্শানো কারণ যথেষ্ট কিনা তাও ট্রাইবুনালের মর্জির উপরই নির্ভরশীল। একজন বা অল্প কজনের ক্ষতি এমনকি মৃত্যুও 'গুরুতর' বা 'বৃহত্তর সমাজের' ক্ষতি হিসেবে গ্রাহ্য না হতেই পারে। ক্ষতিপূরণ, সম্পত্তি বা পরিবেশের পুনরুদ্ধার এসব ট্রাইবুনালের এক্তিয়ারভূক্ত হলেও, আবেদন করতে হবে ঘটনার পাঁচ বছরের মধ্যে এবং পরিস্থিতি যতই গুরুতর হোক, কোনরকমভাবেই ট্রাইবুনাল কোন শিল্পকে অপরাধী গণ্য করতে পারবেনা। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ আদালতে মামলাও করা যাবে না। ভোপালে এখন,

২৫ বছর পরে জানা যাচ্ছে - এখনও পানীয় জল বিষাক্ত, মাটি বিষাক্ত, ফল-ফসলে বিষের অবশেষ। এখনও ভোপালে জন্মানো নবজাতকদের মধ্যে ধরা পড়ছে এমন অসুস্থতা বা অঙ্গবিকৃতি যার উৎস সেই আড়াই দশক আগের বিষ-রাসায়নিক। এরকম ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের মধ্যে কি করে ভবিষ্যৎ ক্ষয়ক্ষতির হদিস পাওয়া যাবে? সিলিকোসিস, অ্যাসবেষ্টোসিস বা বিসিনোসিসের মত ক্যানসার সৃষ্টিকারি ধূলোবালি, অ্যাসবেস্টস তন্তু বা তুলোর তন্তু উদ্ভুত অসুস্থতা প্রকাশ পেতে পাঁচ বছর পার হয়ে যেতেই পারে, যেমন হতে পারে শব্দজনিত বধিরতার ক্ষেত্রেও। নতুন আইন এসব ক্ষেত্রে বধির হয়েই থাকবে।

NCL বা নিউক্লিয়ার সিভিল লায়েবিলিজ বিল প্রযোজ্য পারমানবিক চুল্লি ও পরমানু জ্বালানীর মত পদার্থের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবী পাঁচ বছর পরে করা যাবে না। অথচ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের, বিশেষত কম মাত্রার ধারাবাহিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দরুণ ক্ষতির প্রকাশ যে বিলম্বিত হতে পারে, তা প্রমাণিত সত্য। আরও বেশী দুশ্চিন্তার কারণ এই যে আমেরিকার সঙ্গে পারমানবিক শক্তিচুক্তির আওতায় আমেরিকা বা অন্য দেশের বিনিয়োগকরীরা যে সব চুল্লি বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভারতে নিয়ে আসবে, তাদের উপর কোনভাবে কোন দায় না চাপানোর ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে এই বিলে। ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দায়ভাগী করা যাবে শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (NPCIL) মত ভারতীয় সহযোগী কোম্পানীকে। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমানের উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১৮৬৩ লক্ষ ডলারে। অথচ এমত ক্ষেত্রে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড ও জাপানের মত দেশে ক্ষতিপূরণের পরিমানের কোন উর্দ্ধসীমা নেই। ভারতে পরমানু চুল্লি বসাতে উদগ্রীব আমেরিকান কোম্পানীদের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে ভারত সফর করে গেছেন। বিলটি যাতে পাস হয়ে আইনে পরিণত হয় তাতে তাদের প্রবল আগ্রহ, আগ্রহ ভারতের শিল্প বাণিজ্যের কান্ডারীদের সংগঠন ফিরি'রও (FICCI)।

আমরা কি নিশ্চিত থাকতে পারি - যে ভারতে আর কোন ভোপাল ঘটবে না, ঘটবে না চেরনোবিল? র. ম.

ছয়

আজব খিদে

ডোবা খায় পুকুর খায়
খায় খাল খায় বিল
দিঘি খায় চমুক দিয়ে
চেটে চেটে খায় ঝিল।

গিলে খায় আস্ত সাগর
দেখে এসো নিজের চোখে
এতবড় সিন্ধু আরল
সেও আজ মৃত্যু মুখে।

নদী খায় টুকরো করে
সোনাই আজ গল্প কথা
যে কিশোর বাইত ডিঙা
খুঁজে ফেরে স্মৃতির পাতা।

এ খিদের অন্ত কোথায়
লেখা ছিল যত্ন করে
জবাবের পৃষ্ঠা গুলো
উড়ে গেছে ঘুর্ণি ঝড়ে।।

অ. চ.

(সৌজন্য ঃ প্রগতি বার্তা, ৫ ডিসেম্বর, ২০০৯)

বিষে ভরা
বি টি বেগুন থেকে সাবধান

পৃথিবীতে প্রথম জিন বদলানো মনুষ্যখাদ্য হিসেবে ভারতের বাজারে আসতে চলেছে 'বি টি বেগুন'। কেন্দ্রীয় সরকারের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভ্যাল কমিটি বি টি বেগুন চাষ করার ছাড়পত্র দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের কুখ্যাত বীজ উৎপাদক কোম্পানি 'মাহিকো'-র বকলমে আমেরিকান বহুজাতিক 'মনস্যান্টো' ভারতের মানুষকে বিষ-বেগুন খাওয়াবার সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। ভারতের জনগণকে নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে সেই বিষ-বেগুন বা 'বি টি বেগুন' কিনে খাবার পরামর্শ দিয়েছে 'এ কে আই'।

জিন বদলানো খাবার, সে আবার কী?

সজীব কোষে ডি এন এ থাকে। আর এই ডি এন এ-র এক একটি বিশেষ অংশ হলো জিন। জিন-এর মাধ্যমেই ধরা থাকে জীবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তাই আমড়া গাছে আমড়াই ফলে, আম ফলে না। ছাগল ছানার ডানা গজায় না। উটের পায়ে শকুনির মতো নখ হয় না। কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একদল প্রযুক্তিবিদ হাঁসজারু বানাতে পারেন। তাঁরা ব্যাকটেরিয়া-র বিষ বানানোর জিন নিয়ে বেগুনের কোষে ঢুকিয়ে দিয়ে বি টি বেগুন ওরফে বিষ বেগুন বানিয়েছেন। এরপর আছে, আলু, কলা, পেঁপে, ভুট্টা, রেপসিড, চাল.....।

কাকে বলে বি টি বেগুন?

মাটিতে পাওয়া যায় Bacillus thuringiensis সংক্ষেপে Bt নামের এক রকম ব্যাকটেরিয়া। Bt থেকে পাওয়া যায় এক রকম জৈব কীটনাশক। Bacillus thuringiensis-এর Cry 1Ac নামের জিনটি তুলে নিয়ে বেগুন ভ্রূণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন 'মনস্যান্টো'-র প্রযুক্তিবিদরা। সেই বীজ থেকে গজানো বেগুন গাছের সারা শরীরে আপনা থেকেই তৈরী হবে Bt বিষ। ফলে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে বেগুন, কিন্তু আক্রান্ত হবে মানুষের শরীর।

বি টি বেগুনের কেরামতি নিয়ে মনস্যান্টো-র দাবী

- বি টি বেগুন পরিবেশ ও কৃষির প্রভূত উন্নতি করবে। এটি দ্বিতীয় সবুজবিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ।
- বি টি বেগুন চাষে কীটনাশকের প্রয়োজন নেই! তাই খরচ খুব কম।
- পোকা লাগার ভয় নেই, তাই ফলন অনেক বেশি!
- বি টি বেগুন মানুষের শরীরে কোনো বিষক্রিয়া ঘটায় না। তাছাড়া রান্না করার সময় এই বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

বি টি বেগুনের গুণাবলী - অভিজ্ঞতা কী বলে?

- প্রথম সবুজবিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে বিষিয়ে দিয়ে গেছে মাটি ও জল। নষ্ট হয়েছে মাটির উর্বরা শক্তি। মাটির জলস্তর নীচে নেমে গেছে। এমনটা স্বীকার করেছেন সবুজবিপ্লবের জনক স্বামিনাথন্।
  জিন প্রযুক্তির দ্বিতীয় সবুজবিপ্লব শেষ করে দিয়ে যেতে পারে ফসলের বৈচিত্র্য ও পরিবেশের জৈব বৈচিত্র্য। এলোমেলো করে দিয়ে যেতে পারে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। ইতিমধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেছে তেমন কিছু ঘটনার।
- বি টি বিষ সব রকম ক্ষতিকারক (!) পোকার হাত থেকে ফসলকে বাঁচাতে পারে না। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার কমে না।
  বি টি বিষ অনেক বন্ধু পোকাকে মেরে ফেলে। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার না বাড়িয়ে উপায় থাকে না।
  বি টি বিষ কাজ করতে শুরু করবে তখনই, যখন সম্ভবত অন্যান্য বি টি ফসলের মতো 'রাউন্ডআপ' নামে 'মনস্যান্টো'-র এক বিশেষ আগাছানাশক ব্যবহার করা হবে। ফলে চাষের খরচ বাড়বে বই কমবে না।
- ভারত বেগুন উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয়। এদেশ থেকে বেগুন রপ্তানি হয়। এমনকি উদ্বৃত্ত বেগুন গবাদি পশুদের খাওয়ানো হয়।
  অন্যদিকে ভুট্টা রপ্তানিকারী দেশ মেক্সিকো বি টি ভুট্টা (গবাদি পশুর খাদ্য) চাষ করার পর আজ ভুট্টা আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে।
- ভারতে বি টি তুলো চাষের অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর। বিদর্ভে বি টি তুলো চাষের পর প্রতিদিন গড়ে তিন জন করে চাষী আত্মহত্যা করেছেন। মহারাষ্ট্রে 2005-06 সালে মোট 4000 এর বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 1997-2007, এই পর্বে ভারতে 1,82,936 জন চাষী আত্মহত্যা করেছেন। (সূত্রঃ ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরো)
- বি টি বেগুনের বিষক্রিয়া নিয়ে মাত্র তিন মাসের মধ্যে, সামান্য কিছু এলোমেলো পরীক্ষা করেই বি টি বেগুনকে নিরাপদ বলে দাবি করেছে মনস্যান্টো।
  জৈব-রাসায়নবিদ **গিলেস-এরিক সেরালিনি** পরীক্ষা করে দেখেছেন, ছাগলকে বি টি বেগুন খাওয়ালে তাদের রক্ততঞ্চনজনিত সমস্যা হয়, লিভারের ক্ষতি হয়, রক্তে বিলিরুবিনের হার বাড়ে। অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে খরগোশ, গরু, ইঁদুর ও ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রেও।

- ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এন্ড হাইজিন-এর গবেষণা অধিকর্তা জুডি কারমেন্ - এর রিপোর্ট-এও মনস্যান্টোর পরীক্ষায় সত্য গোপন করার অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, সঠিক সংখ্যায় নমুনা না নেওয়া ও অনেক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা না করার।
- অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক্ষমতা-র জিন 'মার্কার' হিসেবে ব্যবহার হওয়ার বি টি বেগুন খেলে মানুষের শরীরে 15টি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।
- ইতর পরাগযোগ ও হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফারের ফলে দেশি বেগুন ও অন্যান্য জীব বি টি জিন দ্বারা দুষিত হবে। হারিয়ে যাবে দেড় হাজারের ওপর দেশি বেগুনের বৈচিত্র্য।

'আগামী পনেরো-কুড়ি বছরে পৃথিবীর সমস্ত বীজই হবে জৈবপ্রযুক্তিজাত ও পেটেন্টপ্রাপ্ত' - মনস্যান্টো

পেটেন্ট - এটাই আসল কথা। প্রাকৃতিক জীবের মালিকানার পেটেন্ট নেওয়া যায় না। তাই জিন বদলে কৃত্রিম জীবের সৃষ্টি করতে হচ্ছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বেগুনের উৎপাদনের কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়া আগ্রাসনের থাবা বসাতেই প্রয়োজন বি টি বেগুন। এরপর একে একে অপেক্ষা করছে বি টি ঢ্যাঁড়শ, পেঁপে, শশা, কলা, চাল .....।

চাষের চক্রব্যূহ

কৃষককে চাষ করতে গেলে বীজ কিনতে হবে মনস্যান্টো-র মতো কয়েকটি আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে। বীজের ঘুম ভাঙ্গাতে তাদের কাছ থেকেই কিনতে হবে 'রাউন্ডআপ্'। কীটনাশক ও সার প্রথম সবুজবিপ্লবের পর থেকেই কিনতে হয় তাদের কাছ থেকে। সেচের জল-সেও আজ বহুজাতিক সংস্থার কাছে লীজ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। চাষ করে যে বীজ উৎপন্ন হবে, জিন প্রযুক্তির কল্যানে তা বাঁজা। তাই আবার বীজ কিনতে হবে বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে।

বাজার স্বর্গ বাজার ধর্ম

পুঁজির ধামাধরা পন্ডিতরা যতই খোলা বাজারে মুক্ত প্রতিযোগিতার গুণগান করুন না কেন, ভারতের গরিব চাষীর সে সুযোগ নেই। বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে দাদন নিয়ে চুক্তি-চাষে সে বাধ্য। সামান্য দাদনের বিনিময়ে আগাম ফসলের দাম ঠিক হয়ে যাবে। চাষের খরচ চাষীর, ফসল নষ্ট হলে তার ঝুঁকি চাষীর। ইতিমধ্যে ফসলের দাম কমে গেলে বহুজাতিক সংস্থাটি চুক্তি ভেঙে যেখানে কম দাম পাবে সেখান থেকেই ফসল কিনবে। চাষী চুক্তি ভাঙলে তাকে কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনটাই আজ হয়ে থাকে দক্ষিণ ভারতে নারকোল, কফি ও রবার চাষের ক্ষেত্রে।

ক্রেতার অধিকার

চুক্তি চাষের ফসল সরাসরি বহুজাতিক সংস্থার বড়ো বিক্রয়কেন্দ্রে চলে আসবে। রিলায়েন্স বা মেট্রো ক্যাস অ্যান্ড ক্যারি-র শো রুম থেকে তাদের একচেটিয়া দামে কিনে আনবো আমরা। কী কিনছি তা না জেনেই।

পৃথিবীর যে কটা হাতে গোণা দেশে জিন বদলানো খাবার নিষিদ্ধ নয়, সেখানে খাবারের লেবেলে 'জিন বদলানো খাবার' লেখা থাকা বাধ্যতামূলক। ভারতে এমন কোনো আইন নেই। আইন তার, যে দাম দিতে পারে

লেবেল লাগানো বাধ্যতামূলক করার জন্য কোনো আইন নেই। কিন্তু বীজ উৎপাদন না করতে দেবার জন্য আইন আসতে চলেছে। বীজ উৎপাদন করতে লাইসেন্স লাগবে। ফলে চাষী যদি মনে করে, তার উৎপাদিত দেশি ফসল থেকে পরের বছর চাষ করার বীজ সরিয়ে রাখবে, তাকে পুলিসে ধরবে। সরকারের দায়িত্ব বীজ উৎপাদন ও বন্টন। সেই দায়িত্ব থেকে ভারত সরকার সরে আসছেন।

বি টি বেগুন, কারা চায়, কেন চায়?

'আমরা চাই বা না চাই, এখানে জৈব প্রযুক্তি বীজ থাকবেই।' -অধিকর্তা, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ।

এ কে আই - এগ্রিকালচারাল নলেজ ইনিসিয়েটিভ শুরু হবার পর এমন কথা না বলে উপায় কী? মার্কিন সহযোগিতায় ভারতে কৃষি-জ্ঞান চর্চার বিশেষ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর মুখ্য উদ্যোক্তা ইউ এস এ ই ডি এবং মার্কিন কৃষি দপ্তর। এই উদ্যোগে সামিল হচ্ছে মনস্যান্টো, ওয়ালমার্ট-এর মতো বহুজাতিক সংস্থা।

ভারতের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্র ও কৃষিপণ্য বিপনন ক্ষেত্র কেমন করে দখল করা হবে তার সামগ্রিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে 'এ কে আই' -এর মাধ্যমে। একদিকে একচেটিয়া বাণিজ্য করার উপযোগী আইন প্রণয়ন করা, অন্যদিকে পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক নিয়মনীতি শিথিল করা - খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশ ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা মার্কিন বহুজাতিক গুলির হাতে একচেটিয়া ভাবে তুলে দেবার নির্লজ্জ সরকারী পদক্ষেপগুলো আজ সেই পরিকল্পনা অনুসারেই নেওয়া হচ্ছে।

তাই কোনো নিরপেক্ষ গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন না করে মাহিকো-মনস্যান্টোর হাতেই তুলে দেওয়া হলো বি টি বেগুনের মূল্যায়নের ভার। মাত্র তিন মাসের গবেষণার প্রহসনের পরেই 'জি ই এ সি' বি টি বেগুনের ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন।

ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ (এ কে আই) প্রকৃতপক্ষে দেশের কৃষি অর্থনীতি দখলের নীল নকশা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণকারী দলগুলি আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে জলাঞ্জলি দিতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। দ্বিধা নেই এই মহান দেশের হাজার হাজার বছরের জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতিকে ধ্বংশ করে ফেলতে। একচেটিয়া পুঁজির এই ভয়াবহ আগ্রাসনকে প্রতিহত করা দরকার।

একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (ফামা)-র প্রচারপত্র থেকে, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১১ ০০৪৬৪

অমল সোম স্মরণে

কুমারেশ মিত্র

অমলের সম্পর্কে লিখতে হবে। অমল লেখার বিষয় হয়ে গেল! অমল নিজেই লেখা হয়ে আছে 'ঘরেও নহে পারেও নহে' এর নিজের লেখা বইয়ের অন্দর মহলে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তবে লেখার এই অনুভূতি আমকে আলোর উল্টোদিকে বিষন্নতার ছায়ায় টেনে নিয়ে যায়। কেননা এই তো সেদিন মাত্র তিন দশকের ওপারে এবং তারও অনেকদিন পরে অবধি বি-কে-সি কলেজ থেকে এবং কখনও দক্ষিণের শহরেও আমরা দু'জন, অনেকজনও কলকাতার রাজপথে হেঁটে গেছি কতদিন - শিক্ষা, রাজনীতি নিয়ে পরিপার্শ্বের আন্দোলন, নাটক, কবিতা নিয়ে কত কথা হাওয়ায় ভেসে গেছে। অমল ছিল এসবে সদায় সক্রিয় অংশীদার। সব কথা, সব আলোচনার মালা গাঁথার বৃত্তী পরিধিতে ওর ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি। সত্তরের দশকে কলকাতা টালমাটাল অবস্থায় ও ছিল আমাদের কলেজীয় পরিবেশ সম্পর্কের সক্রিয়তায় অগ্রনী। না কোন দুরন্ত কর্ণ-ভেদী ঝংকার ওর ছিল না। সেদিক থেকে জন-সমক্ষে সাধরণত অমল ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ এবং বিনীত। তবে আমাদের অন্তরদা বন্ধুমহলে চারপাশের মানুষের চরিত্র চিহ্নিনে ছিল দুরন্ত রকমের অকপট, মানুষের মন নিয়ে ভাবনা-জাত ও বিশেষণী শব্দগুলো কখনও কখনও ও একদমই ইতস্ততঃ না করে আমাদের বলে ফেলত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি আমাদের পরিচিত কেউ হত, আমরা কেউ চূড়ান্ত ভাবাবেগের তাড়নায় তীব্র উষ্মা, অসন্তোষ প্রকাশ করলেও অমল অবিচলিতই থাকত। তীব্র প্রতি-আক্রমনের মুখেও আমি অমলকে সারাজীবন কখনও অস্থির, অশান্ত হয়ে পড়তে দেখিনি বললেই হয়। (সারা জীবনের নিরিখে এর দুয়েকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত থাকতেই পারে)। এরকম অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছিল অমল সোম। নিজের প্রিয়তম নিকট আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-মহল ওর শান্ত সমালোচনার জাল ছিন্ন করে মুক্ত থাকতে পারেনি যখন, সেই সময় নিরিখে দূর ভবিষ্যতে দেখেছি ওর চরিত্র অন্বেষণের বিশ্লেষণের বৃত্তের মধ্যে কোথাও বাস্তবতার মূল গভীরে পোঁতা ছিল। প্রচ্ছন্ন আবেগে ওর অন্দর মহলে সবসময় বাস্পায়িত হলেও প্রায় সব রকম সাধারণ -অসাধারণ পরিস্থিতিতে দিন থেকে দিনে মাসের পর মাস এবং অনেক বছর ঘুরে গেলেও অমলকে দেখেছি একজন নিরুদ্বেস, উত্তেজনা-অপ্রবণ, বন্ধু-বৎসল। পারিবারিক কর্তব্যে সু-সচেতন মানুষ হিসাবে। অবশ্য কোন কর্মকান্ডকে ওর অন্যায় অযৌক্তিক মনে হলে তার উৎসে যে মানুষই থাকুক না কেন অমল ক্ষোভে বিস্ফোরিত হত তবে বিস্ফোরনের মাত্রা থাকত পরিমিত পরিশীলিত, অন্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে ওর যতই মতান্তর ঘটুক না কেন।

সত্তরের দশকেই আবিষ্কার করে ফেলি শিক্ষক জীবনে অমল ছিল কঠোর পরিশ্রমী ও মেধাবী, ছাত্ররা কলেজে আমাদের ডিপার্টমেন্টে অনেক বেশী যত্ন ও মনোযোগ পেয়েছে ওর কাছ থেকেই। আড্ডা, আলোচনা, আলোড়নে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সত্তরের শান্ত, অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেই অমল এক বৃক্ষের ডালপালা হিসেবেই বি-কে-সি কলেজে সুসংহত ফিজিক্স পড়ানোর এক গভীর (ডিপার্টমেন্ট সহকর্মী) প্রয়াস তৈরী করে ফেলেছিল বন্ধুদের সক্রিয় সাহায্য নিয়েই। গ্রীষ্মের ছুটিতে এবং অন্য সময়ে বি-কে-সি কলেজ অতিরিক্ত ক্লাসের মাধ্যমে ফিজিক্স পড়ানো ও শেখানোর ঢেউ আছড়ে পড়েছিল অনেকদিন ধরে-যার রেশ চলেছিল প্রায় আশির দশক অবধি। এইসব গঠন মূলক কর্মকান্ডের নেতৃত্বে অমলের লাজুকতা থাকলেও তাতে ছিল ওর সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা।

বই পড়া অমলের কাছে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। রেস্তোরায় বসে, বন্ধুর বাড়ির ফটক দরজায় অপেক্ষামান অবস্থায়, কোলাহলময় ডিপার্টমেন্টের অন্দরে বসে ও অনায়াসেই বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে যেতে পারত। যৌবনে ও কত বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়েছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে আমাদের কলেজ লাইব্রেরীর বই ইস্যু করার রেজিষ্টার খাতাটা খুলে দেখলেই। অমলের সঙ্গে থেকে ওর চারপাশের বন্ধুদের পড়াশুনায় এক চোরা স্রোতের গতিময়তা তৈরী হয়ে গিয়েছিল বলেই আমার ধারনা। সত্তর দশকের শেষার্দ্ধ থেকেই অমল psychology ও psychiary সম্পর্কিত অনেক বই পড়ে ফেলেছিল মানুষের মন নিয়ে ভাবার বীজ ওর মধ্যে হয়ত আরও আগে থেকেই নিহিত ছিল। পরিবার ও চারপাশের সমাজে মানসিক বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের জন্যে হাসপাতাল, নার্সিং হোমের মত

মনোরোগ নিষ্করণ জেলখানাময় মনের দেওয়ালের কথা ভেবে ভাবনার রাজ্যে মনোরোগ নিয়ন্ত্রন ও উপশমে ও এক নতুন মুক্ত চিন্তা আমদানি করল বন্ধু-মহলে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮১ সালে জন্ম নিল 'সৃজনী'। পরবর্তিতে নাম হল 'মানস'।

এখানে তাই ব্যক্তি অমল এবং সংগঠক লেখক অমল এই দুই সত্তার উদ্ভাস ঘটাতে ওর লেখা বই 'ঘরেও নহে, পারেও নহে'র মর্মবস্তুর আলোচনায় চলে আসি। অসুস্থ যে মানুষগুলি মানসিক ভারসাম্যহীনতায় হয়ে পরে পরিবারের বাইরের কেউ নয় আবার পুরোপুরি যে ঘরের লোকও নন, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে' তারা 'অনিকেত' 'উদ্‌ভ্রান্ত' নিজনিজ দ্বীপবাসী। অমল এদেরই কথা আমৃত্যু ভেবেছে, সারা জীবন ধরে লিখে রেখে গেছে রোগ উপশম, নিরাময়ের বিকল্প ডপায়সমূহ ও সে সম্পর্কীয় নিজেদের কর্মকান্ড নিয়ে।

বংশগত হর্মোন-জাত বিশৃঙ্খলায় মস্তিষ্কের ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে তৈরী হওয়া অনিয়ম গুলো নাকি কোমল মনের ওপর ধ্বংসাত্মক সামাজিক পরিবেশ কোনটায় বেশী বেশী করে মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে? সে প্রশ্ন আজও বিজ্ঞানের নিরিখে অমীমাংসিতই থেকে গেছে। তাই মানসিক রোগের চিকিৎসায় সমাজ-সচেতন মানুষ শারীরবৃত্তিক ও সামাজিক মডেলের সমন্বয় ঘটালেও কোনটি বেশী প্রধান্য পাবে সেটা বিবেচনার বিষয়। অমল দেখেছে মানসিক রোগের কারণ সামাজিক বটে - ভারসাম্যহীন মানুষের আচরণের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মূলে পারিপার্শ্বিকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠি সামাজিক মানবিক পরিবেশে মনোরোগ উপশম ও নিরাময়ের মডেল তৈরী করলেও সংস্কার আচ্ছন্ন ভারতীয় পশ্চাদ্-মুখী পরিবেশে বাঙালি মানসিকতায় অমলের চিন্তা-ক্রম যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। অমল মনে করে, পাগল তো জন্তু নয় - সে একজন সমস্যা-পীড়িত মানুষ, যার মানুষেরই সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে বিবেচনা করার মানসিকতা ও মানবিকতা টুকু মাত্র আমাদের থাকার দরকার। তাই ভয় প্রথম দিন থেকেই মানসিক রোগ নিয়ে বিব্রত পরিবারগুলিকে এক যৌথ উদ্যোগ সম্মিলিতভাবে নিজেদের সমস্যা মোকাবিলা করার ডাক দিয়ে এসেছে। এর মূলমন্ত্র হবে - ন্যূনতম ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীকে স্বাভাবিক পরিবেশে রেখে প্রভূত সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে রোগোত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা, যেখানে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিন্তু অকারণ নির্যাতন ও বন্দীত্ব থাকবে না। যত্ন-পরিষেবা ও নিয়ন্ত্রনের ভারসাম্য রেখে মানস হয়ে উঠতে পারে মানসিক রোগের একটি আদর্শ আরোগ্য ও আনন্দ নিকেতন। মূলতঃ মানসিক রোগীদের পরিবার, সেরে ওঠা, সেরে-না-ওঠা মানসিক রোগী ও শুভাকাঙ্খীদের দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থাকে অমল রোগ-জর্জরিত মানুষ ও তাদের পরিবারদের একটি 'মঞ্চ' হিসাবেই অভিহিত করেছে। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী অমল ১৯৯৪ সালেই একে প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করতে চায় নি কেননা প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরিণাম হল সমাজের মূল প্রবাহে হজম হয়ে যাওয়া, মূল স্রোতের বাইরের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলা। স্রোতের বাইরের চরিত্র না থাকলে বেপথু মানুষ ও তার সমস্যাকে ধারণ করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সংস্থায় সেরে ওঠা মানুষ যন্ত্রমানবে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাই অমল ও তার সহকর্মীরা মানসকে মূলত ভাবনা-রাজ্যে একটি আন্দোলন হিসাবেই রাখতে চেয়েছে। 'কনভেন্‌শনাল অরগানাইজেসন' বলতে যা বোঝায় যেমন ক্যাজ র, নেতা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, অফিস, সদস্যদের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য এরকম কিছু নয়। কেননা এটা একটি ওপেন অরগাইজেশন যেখানে কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নেই, অংশ গ্রহণের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, নেই কোন মতাদর্শ। শুধু মানসিক ভারস্যহীনতা উদ্ভুত সমস্যাগুলি একটু গভীরভাবে বুঝে সমস্যা পীড়িত পরিবারগুলির মানুষের সহায়তায় আরেকটু ভালোভাবে বাঁচার তাগিদ ও প্রয়াসে নিঃসঙ্গ মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোই মানসের উদ্দেশ্য, রোগীর সারা জীবনের দায়-দায়িত্ব নেওয়া নয়।

একটা ধারণা আছে, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দরকার হয়। অমল এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, অমলের মতে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা ও ক্ষেত্রটি খুবই সামান্য। মানসিক রোগের উৎপত্তির কারণ যাই হোক না কেন বিশেষজ্ঞ নাক গলালেও সমস্যাটা সামাজিকই থেকে যায়। তাই সাধারণ মানুষের ভূমিকা এখানে বিশেষজ্ঞদের চেয়ে আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ সম্পর্কে অমলের আরও দাবি - সম্ভবত পঃবঙ্গে মানস-ই সর্বপ্রথম মানসিক রোগ চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষের যে একটা এক্তিয়ার ও পালনীয় ভূমিকা আছে, তা চর্চার মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেছে।

মানসে কে থেরাপিষ্ট, সাইকোলজিষ্ট, সাইকিয়াষ্ট্রিস্ট, কেই বা স্বেচ্ছাসেবী, রোগী, পরিবার, সংস্থার সদস্য, অ-সদস্য, সম্পাদক - এই ভেদাভেদ খুবই কম ও অস্পষ্ট। মানসে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে স্বেচ্ছা-সেবীদের অংশ গ্রহনে সমৃদ্ধ কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে যৌথ থেরাপিউটিকের ধারণা গড়ে উঠেছিল। এখানে সবাইকে যৌথ টিম-ওয়ার্কের মেজাজে চলতে হয়, পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণ হায়ারার্কি-বিরোধী। একটা থেরাপিউটিক কমিউনিটির যা মূল -মন্ত্র তা এই টিমের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ও সহজভাবেই আছে। এর জন্যে সচেতন ও সতর্কভাবে অনুশীলন করতে হয় নি অমল লিখিছে। এখানে সত্যিকারের অর্থে গণতন্ত্র বিরাজ করে, এখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী গোটা টিমকেই চিকিৎসায় অংশ গ্রহণ করতে হবে - সাইকিয়াট্রিষ্ট ওষুধ নির্বাচন করে দেবে, কাউন্সেলিংয়ের দায়িত্বে থাকবে অন্যান্যরা, একদল সেবা দিচ্ছে, অন্য দল সেবা নিচ্ছে এই বিনিময়ের হাট এটা নয়। মানস আশ্রমকে হতে হবে মিলন মঞ্চ, মিলন-মেলা। প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে ছাড়িয়ে যেতে হবে অপরূপে। কিছু নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি থাকতেই হবে; কিন্তু নিয়মকানুন, ফরম্যালিটির নাগপাশে শ্বাসরুদ্ধ হবে না এ সংস্থায়।

এই যৌথ টিম-ওয়ার্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল স্বেচ্ছা-সেবীদের, কেননা তারাই হল চিকিৎসক ও রোগীর পরিবারের মধ্যে সেতু-স্বরূপ সমন্বয়কারী দল। স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালন করতে হলে মানুষ জনের প্রতি সদা জাগ্রত আগ্রহ থাকা চাই - রোগী ও পরিবারের সমস্যার গভীরে ঢুকে তাদের মূল অসুবিধাগুলি জেনে নেওয়া ও তা দূরিকরণে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করার উৎসাহও থাকা চাই। মনে রাখতে হবে, রোগী ও পরিবার উভয়েই এক সূত্রে গাঁথা এক জটিল সমস্যার আবর্তের মধ্যে আছে। স্বেচ্ছাসেবীদের কাজের সর্বোচ্চ স্তর হল কাউন্সেলিং। কেননা ডাক্তারবাবুরা তাদের কর্মপ্রণালি প্রভাবশালী মতাদর্শ অনুযায়ী মানসিক রোগকে মূলত মানুষের মাথার সার্কিটে গন্ডোগোল হিসেবেই বিবেচনা করে কাউন্সিলিংয়ে মনোনিবেশ করে, যেখানে সামাজিক প্রেক্ষাপটটা হারিয়ে যায়। আবার যেহেতু মানস প্রথম দিন থেকেই মানসিক রোগ চিকিৎসায় ও পুনর্বাসনে সমাজ ও অ-বিশেষজ্ঞ সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। তাই অমলের মতে অ-সাইকিয়াট্রিস্ট অ-মেডিকেল ব্যক্তির হাতে কাউন্সেলিংয়ের গুরু দায়িত্ব থাকা উচিত। তাই সচেতন দরদী স্বেচ্ছাসেবীরাই এই কাজ করতে পারে। অবশ্য পুনর্বাসনের স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক রোগ নিরাময়ে প্রথম থেকেই যদি পুনর্বাসনের লক্ষ্য না থাকে, তবে 'মানসের ভাবাদর্শে চিকিৎসা করা অর্থহীন'।

কলকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী স্বাভাবিক মানুষ মিলে প্রতি শনিবার বিকেলে যে রিক্রিয়েশন ক্লাব তৈরী হয়েছিল, তা বহু বছর স্থায়ী ছিল। এখানে পরিবেশ সচেতনভাবে এমনই তৈরী ছিল যে কে রোগী, কেইবা স্বাভাবিক মানুষ তা বোঝার উপায় ছিল না। মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকারে কোন মানুষ দৃষ্টিকটু ব্যবহার করলে তা সচেতনভাবেই উপেক্ষা করা হত। এখানে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিকে মিলে যৌথ অঙ্কন, যৌথ কবিতা লেখা, কোরাসে গান গাওয়া, দলবদ্ধ খেলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে এক অনাবিল আনন্দের দীপ্যমান সলতেটাকে উসকে দেওয়া হত। রোগীর চিকিৎসায় টিম ওয়ার্কের মতই রিক্রিয়েশন ক্লাবের যাবতীয় কার্যকলাপে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হত। অমলের কথায়, এটা কোন সংশোধনী কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে নি, তবে পূর্বে উল্লেখিত যৌথ থেরাপিটিকে সহায়তা দিয়েছে। এই কেন্দ্রটি কেন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, তার একটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়ে গেছে।

কিছু সংস্থা আছে যারা পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকার বিনিময়ে রোগীর আমৃত্যু ভার নিতে প্রস্তুত। মানসের ভাবাদর্শ অনুসারে এমন কি এক কোটি টাকার বিনিময়েও সে এই দায়িত্ব নেবে না। যদি এই দায়িত্ব নিতেই হয়, তবে তা সরকারই নিতে পারে। অমলের মডেল অনুযায়ী যাদের কিছু আর্থিক সঙ্গতি আছে এমন অভিভাবকেরা একটা বোর্ড বা সংস্থা গড়ে তুলবে যেখানে অতি অবশ্যই অভিভাবকদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকবে। এই বোর্ড রোগীর সারা জীবনের আর্থিক, নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব নিয়ে মানস আশ্রম বা টোটাল কেয়ার ইনস্টিটিউসনের আদলে তৈরী সংস্থার (যেমন 'অন্তরা', 'নরম্যান্ বেথুন' ইত্যাদি) সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে ২-৫ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিজেদের রোগীদের সেবা-শুশ্রুষার ভার দেবেন। বিকল্প হিসাবে অভিভাবকেরা ব্যক্তিগত ট্রাষ্ট গঠন করে মানসের দু একজন সক্রিয় প্রতিনিধিকে নিয়ে একটা কো-অর্ডিনেটিং কমিটি তৈরী করতে পারেন যারা মানসের পরিষেবা, বিশেষজ্ঞ সার্ভিস ও সব রকম প্রোগ্রামের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে অভিভাবক-হীন অভিভাবক-যুক্ত রোগীদের ভার নেবে (পৃঃ ১৩৮-১৪১)।

অভিভাবকদের এই স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী তৈরীর প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে গভীর অসুস্থতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ার আগে অবধি অমল ওঁদের নিয়ে মানসে মদনপুরে ২০০৭ সালের মধ্যে অন্তত ছটি ক্যাম্প সংগঠিত করে যেখানে একসাথে ওঠাবসা, খাওয়া দাওয়া দিন থেকে রাতের আলোচনায় ঠেকে শেখার নিয়ম অনুসারে ও অভিভাবক সংগঠনের কিছু নিয়ম-কানুন ও ফরম্ সম্পর্কে ধারণা তৈরী করে ফেলে। ইতিমধ্যে অমলের কয়েকজন সাথী ও সহকর্মী সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে বিপুল সংস্থান সংগ্রহ করে মদনপুরে রোগী, অ-রোগীর স্বল্প-মেয়াদী আবাস অমলের স্বপ্নের প্রকল্প 'ক্ষণিকা' তৈরী করে ফেলেছে। এই ক্ষণিকা আবাসনে পারিবারিক প্রতিকূল পরিবেশে আগ্রাসী মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন মানুষকে কিছুটা মুক্তি দিতে বা মানসিক রোগীর মনোবলকে প্রতিকূলতা সৃষ্টিকারী পারিবারিক সংনদ্য, এমনকি প্রয়োজনে পুরো পরিবারটিকে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ন্ত্রণে এক আনন্দময় পরিবেশে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন এখানে শুধু সুস্থ অসুস্থ মানুষদের আনাগোনা-এ এক অতিথিশালা। এই 'ক্ষণিকা' থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে 'চিরন্তিকার' যা মানসিক রোগীর দীর্ঘমেয়াদী বা আজীবন দায়িত্বভারের ব্যবস্থাপনা তৈরী করবে। আমাদের পৃথিবী ছেড়ে অমল চলে যাওয়ায় মানসের বর্তমান কান্ডারীদের ওপর দায়িত্ব পড়ে গেল ওর মানস ভাবনার একটা চূড়ান্ত রূপ, যৌথ পরিবারের ধারণাকে পরিপূর্ণতায় রূপায়িত করা - একটি আশ্রম-জাতীয় আস্তানা। এই মানস আশ্রমের পরিচালনায় রোগী, পরিবার পরিজন, স্বেচ্ছা-সেবী, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কর্মীরা হায়ারার্কি-বিরোধী পরিবেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবে।

মানস নিয়ে অমলের লেখা না-লেখা ভাবনার সীমান্ত খুঁজে বার করা দুস্কর - আকাশই কেবল তার সীমা হতে পারে। তাই ওর ভাবনার রূপায়ণে ব্যর্থতায় অমল উষ্মা প্রকাশ করতে কোন রকম রাখ-ঢাক্ করেনি। অনেক আগেই ১৯৯৪ সালে অমল লিখেছে - 'প্রয়োজন একটি টিম-ওয়ার্ক - সাইকিয়াট্রিস্ট + সাইকোলজিস্ট + কাউন্সেলর + ওয়ার্কি থেরাপিস্ট + ফ্যামিলি ভিজিট + ফলো আপ ডিজিট + পুরোনো রোগী ও রোগীদের বাড়ির লোকদের থেকেও স্বেচ্ছা-সেবী - এসব মিলে গড়ে উঠবে'। এ ছাড়া আরও প্রয়োজন ঃ 'রোগীর ডিটেল কেস হিস্ট্রি ও রেকর্ড রাখা' রোগীর পরিবারের সঙ্গে থাকা .... গ্রুপ-এ চিকিৎসা করা' .... 'পুনর্বাসনের জন্য এখানে কাজের ব্যবস্থা করা। যেমন পটারি, নার্সারি মাসরুম চাষ ইত্যাদি'। এরপর ওর আক্ষেপ - 'এই সব দিকে এক পা-ও এগোতে পারি নি, পারবো কিনা সন্দেহ, কেননা আমার দম ফুরিয়ে আসছে'।

এর পরেও অদম্য প্রাণ-শক্তির উৎস অমল মানস নিয়ে ভেবেছে, লিখেছে, আমৃত্যু জান কবুল করে গেছে মানসেরই জন্য। সভাপতির কাছ থেকে খবর পেয়েছি ওরা অমলোত্তর পরিস্থিতিতে ওর চিন্তাকে মাথায় রেখে কতক নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছে। আসুন আমরা সবাই অমলের মানস ভাবনার সাথে বাস্তবতার সুমিশ্রণে এক নতুন মানসিক সংগঠন গড়তে হাত মেলাই।

অমল সোমের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। স্কুলে পড়াশুনা প্রথমে পার্ক সার্কাসে মর্ডান স্কুল (ফর বয়েজ) -এ, পরে নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে। চিরকালই ও ভালো ছাত্র ছিল। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যায় বি.এস্ সি (অনার্স) ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস্. সি ডিগ্রি লাভ করে। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সাল থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৫ সাল অবধি অমল ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র কলেজ (বনহুগলি, কলকাতা) পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করে। অধ্যাপক জীবনের শুরুতে ও যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্যাটার্ন রেকগ্‌নিশনে পি.এইচ্ ডি ডিগ্রি অর্জন করে।

মা, বাবা, দাদা ও দুই দিদিকে নিয়ে অমল এক সংস্কৃতিবান পরিবারে বড় হয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়াও সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে ওর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। মানসিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ নিয়ে সমস্যাসঙ্কুল পরিবারের সীমানা অতিক্রম করে অমল ১৯৮১ সালে 'মানস' নামে একটি 'নন্-কনভেনশনাল' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। মানসিক রোগ চিকিৎসায় ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনে বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা চর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করায় মানস অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৯২ সালে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে যে 'ফোরাম ফর মেন্টাল হেল্‌থ মুভমেন্ট'-এর প্রতিষ্ঠা হয় অমল ছিল তার প্রথম আহ্বায়ক।

দুরারোগ্য ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগে অমল গত ১১ জুলাই, ২০০৯ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

ভারতের মৎস্যজীবি ও উপকূল রক্ষা আন্দোলনের পুরোধা হরেকৃষ্ণ দেবনাথ প্রয়াত

প্রদীপ দত্ত

নাকে অক্সিজেন নিয়ে অনর্গল কথা বলে চলেছেন হরেকৃষ্ণদা। এমনকি রাইলস টিউব নিয়েও তাই। কথা বলতে বলতে ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন। অক্সিজেন নিয়েও হাপরের মত বুকের খাঁচা উঠছে নামছে - এই বুঝি শেষ হয়ে গেলেন। তবু কথা বলা বন্ধ করেন নি, বলতেন, 'আমি তো লেখক নই। কথাই আমার সব। এখন কথা না বলা মানে মরে যাওয়া'। মৃত্যুর আগে তিনি মরবেন না। এভাবেই ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে মৃত্যুর দু-সপ্তাহ আগেও তিন ঘন্টার ওপর কথা বলেছেন মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে। এই ছিলেন হরেকৃষ্ণ দেবনাথ। ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯, ষাট বছর বয়সে, অকৃতদার হরেকৃষ্ণ দেবনাথের লড়াই শেষ হলো।

'আমার মৃত্যুর দিন হাতে গোনা যায়। বন্ধু মন খারাপ করার সময় এখন নয়, মৎস্যজীবিদের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ ঠিক করতে হবে, যেতে হবে বহুদূরে - বলেছিলেন হরেকৃষ্ণ দা, গত জুন মাসে কলকাতায় ন্যাশনাল ফিসওয়ার্কাস ফোরামের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায়। ততদিনে পৃথিবীর ঠিকানা থেকে তাঁর নাম কেটে দেবার ফরমান জারি হয়ে গেছে। অথচ তার মাত্র একবছর আগে 'তট বাঁচাও, মৎস্যজীবি বাঁচাও' স্লোগান নিয়ে কচ্ছ থেকে কন্যাকুমারী হয়ে কলকাতা পর্যন্ত উপকূল জুড়ে দুমাসব্যাপী প্রচার অভিযান ও পার্লামেন্টে চার দিনের ধর্নার ফলে প্রস্তাবিত কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোন নোটিফিকেশন রদ করতে সরকার বাধ্য হয়। সে কারণেই গত ডিসেম্বর মাসে মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ বলেছিলেন, 'উপকূলের মৎস্যজীবিদের সমস্যা ও আন্দোলন আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি'।

অশোকনগরে বেড়ার ঘরে বাস করেই দীর্ঘকাল ধরে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আশির দশক থেকে তিনি পর্যায়ক্রমে ন্যাশনাল ফিসওয়ার্কর্স ফোরামের সেক্রেটারি ও চেয়ারপার্সন, ওয়াল্ড ফোরাম ফর ফিসার পিপলস - এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ও পরে এক্সিকিউটিভ মেম্বার, ন্যাশনাল কোস্টাল প্রোটেকশন ক্যাম্প-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। পরিবেশ আন্দোলনেও বিশেষ ঝোঁক ছিল। যে কারণে পরিবেশবাদী সংগঠন 'দিশা'র সাথে যুক্ত ছিলেন, হরিপুর পরমাণু শক্তি প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব তৈরীর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছিলেন, উপকূলের মৎস্যজীবিদের গাছ লাগাতে সংগঠিত করেন।

যাঁদের জন্য বলার কেউ নেই সেই মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করার কাজে কি করে জড়িয়ে গেলেন বোঝা মুসকিল হলেও তাঁর জীবন বরাবরই বিচিত্র খাতে বয়েছে। পদার্থবিদ্যায় স্নাতোকোত্তর শ্রেণীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটে একমাত্র হিন্দু ক্যান্ডিডেট হয়েও ছাত্রলিগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি শেখ মুজিবর রহমানের স্নেহধন্য ছিলেন, দৈনিক 'পদক্ষেপ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তাঁর কথায়, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের টালমাটাল অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন। ফিরে যাবার সুযোগ হয়নি। বছর দুয়েক আগে তাঁর মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনও না। এখানে থেকে ছটফট করেছেন। এদেশে এসে উদ্বাস্তু হিসাবে বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের লড়াই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

কথা বললে কষ্ট তাই তার কথা বলার বারণ ছিল। তবু তাঁর কথা বন্ধ ছিল না, এখন তাঁকে নিয়ে কথা বলছেন সারা ভারতের মৎস্যজীবিরা। কাকদ্বীপ, কচ্ছ থেকে কন্যাকুমারী - সর্বত্র তাঁকে স্মরণ করছেন।

Space Donated by

A WELL WISHER

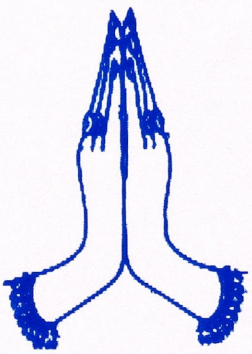

Vigyan O Vigyankarmi Rs. 30.00 Vol. XXXI No. 1- 4
Rn. No. 34929/79 January 2009 - December 2009

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে শান্তি
আর্ট প্রিন্টার্স, ৪১/১এ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি - ১২, ফোন ঃ ২২৪১৯৫৪০ থেকে মুদ্রিত।